হারামণি

[প্রথম খণ্ড]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

উৎসর্গ

সঙ্গীতাচার্য আলাউদ্দীন খাঁ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

স্মরণে

আশীর্বাদ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল, আমিও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি। আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল-সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,—শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল,

"কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ"—যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়—যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর—তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন "মনের মানুষ" ব'লে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেককাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের

গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোক-সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে' বিশ্বাস করিনে।

সকল সাহিত্যে যেমন লোকসাহিত্যেও তেমনি, তার ভাল মন্দের ভেদ আছে। কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মতো অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তারপর একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরি করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধিতা চ'লে যায়, কৃত্রিমতায় নানাপ্রকারে বিকৃত হ'তে থাকে। অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ'লে গেছে তা চলতি হাটের সস্তা দামের জিনিস হ'য়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ,—তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর ক'রে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এইজন্যে সাধারণত যে-সব বাউলের গান যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম বেশী নয়।

তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষীয় চিত্তের যে একটি বড় আন্দোলন জেগেছিল সেটি মুসলমান অভ্যাগমের আঘাতে। অস্ত্র হাতে বিদেশী এলো, তাদের সঙ্গে দেশের লোকের মেলা হোলো কঠিন। প্রথম অসামঞ্জস্যটা বৈষয়িক অর্থাৎ বিষয়ের অধিকার নিয়ে, স্বদেশের সম্পদের ভোগ নিয়ে। বিদেশী রাজা হ'লেই এই বৈষয়িক বিরুদ্ধতা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মুসলমান শাসনে সেই বিরুদ্ধতার তীব্রতা ক্রমশঃই কমে আসছিল কেননা তারা এই দেশকেই আপন দেশ ক'রে নিয়েছিল, সুতরাং দেশকে ভোগ করা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের অংশীদার হ'য়ে উঠলুম। তা ছাড়া, সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে, এদেশের অধিকাংশ

মুসলমানই বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান। সুতরাং দেশকে ভোগ করবার অধিকার উভয়েরই সমান। কিন্তু তীব্রতর বিরুদ্ধতা রয়ে গেল ধর্ম নিয়ে। মুসলমান শাসনের আরম্ভকাল থেকেই ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাই আপন জীবনে ও বাক্য-প্রচারে এই বিরুদ্ধতার সমন্বয়সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাঁদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি ক'রেই দুরূহ পরীক্ষার ভিতর দিয়েই মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্ঘাটিত ক'রে আনেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবেই সেই শ্রেষ্ঠের দেখা পেয়েছি, আশা করি আজও তার অবসান হয়নি। যে সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেছে, সেই সব চিত্তে সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীনকালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিতে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্যদেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কি রকম কাজ ক'রে এসেছে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন, আমি তার অভিনন্দন করি,—সাহিত্যের

উৎকর্ষ বিচার করে নয়, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।

শান্তিনিকেতন
পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার অসীম অনুগ্রহে আমার সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের পরিশ্রম ও যত্নের ফল আমার স্বদেশবাসীর ও আমার মাতৃভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে সসঙ্কোচে স্থাপন করিতেছি। আমরা অতি আগ্রহ সহকারে বাঙলার পল্লী হইতে যে গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেন না নিজের জিনিসের প্রতি মমত্ববোধে লোক ন্যায় বিচার করিতে পারে না। কিন্তু তবু এই স্থানে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে এই গানগুলির সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি যাহা বাহিরের পাঠক বা দর্শকের অনভ্যস্ত চক্ষে সহজে সহসা ধরা পড়িবে না।

প্রথমে কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া এই গানগুলি সংগ্রহ করিতে শুরু করি। কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে Percy's Reliques-এর খুব প্রশংসাবাদ দেখিতে পাই, এবং রাজশাহী কলেজের পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, আই-ই-এস মহোদয় একদিন প্রকাশ্য সাহিত্য সভায় আমার প্রচেষ্টার যৎপরোনাস্তি আন্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার ফলে আমার হৃদয়ে বাঙলার পল্লীগান সংগ্রহ করিবার বাসনা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

কর্তব্য সম্পাদনের অবসরকালে যে সময়টুকু আমরা পাইতাম তখনই উহা পল্লীগান সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিতাম। এক কথায় পল্লীগান সংগ্রহ আমার ভয়ানক রোগের মত দাঁড়াইয়া যায়।

সাধারণত বৈরাগী ও মুসলমান নিরক্ষর চাষীদের নিকট হইতে এই গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। রাজশাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জিলা হইতে এই গানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই সংগ্রহে লালন ফকিরের অনেকগুলি গান রহিয়াছে। লালনের বাড়ী নদীয়া জিলায়। তাঁহার অসংখ্য শিষ্য। তাঁহার শিষ্যেরা সুফী দরবেশের মত চক্রাকারে বৈঠকে বসে। তৎপরে তাহারা গান শুরু করে।

গানের নানা প্রকার ধারা আছে। সাধারণত চক্রাকারে ভজন গান করে। ভজন গান গাহিতে গাহিতে তাহারা তন্ময় হইয়া যায়। এই

গানগুলিকে সাধারণত দেহতত্ত্ব বা শব্দ গান বলে। কোথাও কোথাও এই গানকে মারেফাত গান কহে। এই সকল গানে অনেক সূফী পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। কোন কোন গানে আবার সূফী ও হিন্দু পারিভাষিক শব্দও পাওয়া যায়। এই সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় এককালে উত্তর ভারতের মত আমাদের বাঙলাদেশে কবীর, দাদুর জন্ম হইয়াছিল। এই ধারাটির সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাই না। উহা হারাইয়া গিয়াছে বা অন্তঃসলিলা ফল্গুরমত লোকসঙ্গীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। লোকসঙ্গীতের মূল্য এই স্থানে অতীব উচ্চে। আমাদের মধ্যে কে এই ছিন্ন যোগ-সূত্রের যোগাযোগ স্থাপনে অগ্রসর হইবেন ?

কবি শশাঙ্কমোহন বলিতেন, "আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকিরের মধ্যে অন্তরঙ্গ মধুর সম্বন্ধ বর্তমান আছে।" সত্যই পাগলে পাগলে মিলন ঘটে।

এই সকল গানেও তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোথাও বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। এগুলি যেন অন্ধকার রাত্রের রজনীগন্ধার ন্যায় রাজনৈতিক পতন ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া আপনার অমল সৌন্দর্য বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। উহাতে এতটুকু কলুষ লাগে নাই।

উত্তর ভারতের কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুর হিন্দী রচনাগুলির মধ্যে যে প্রকার উদারতা ও আন্তরিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই গানগুলির মধ্যে তাহার অভাব নাই।

ভজনগান, গীতি কবিতা, গীতি কবিতা জাতীয় গান আবার নানা প্রকার। বাউল ও ফকিরেরা যখন নতুন দুই দল এক স্থানে সমাগত হয় তখন তাহারা নিজেদের দলের গুরুকে বড় প্রমাণ করিবার জন্য গানের উপরে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দুর্বোধ্য প্রশ্ন ও হিঁয়ালীচ্ছলে আক্রমণ করে। যাহারা ঐ গানের জওয়াব দিতে পারে তাহাদের সঙ্গে আবার গানের পাল্লা হয়। উত্তরোত্তর ঐ গানের পাল্লা বেশী হইতে থাকে। এমনও শোনা যায় যে সারারাত্রি শুধু উত্তর প্রত্যুত্তরের গান করিতে শেষ হইয়া যায়। আমাদের নিকট যে সকল গান দুর্বোধ্য, উহার জোড়া গান একসঙ্গে শুনিতে পাইলে তদ্রূপ হইত না। প্রত্যেক হিঁয়ালী গানের জোড়া আছে।

গীতি কবিতা জাতীয় অন্য গান আছে তাহার সহিত তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নাই। এই গান সাধারণত ধুয়া, বারোমাসী, জারী,

শারী প্রভৃতি নামে অভিহিত। ধুয়া গানের আবার প্রকার ভেদ আছে, রসের ধুয়া, চাপান ধুয়া প্রভৃতি। জারীগান সাধারণত কারবালায় নিহত শহিদকে লইয়া রচিত। এই গান অত্যন্ত করুণ। এই গান শ্রবণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা অসম্ভব। জারী পার্সি শব্দ অর্থ ক্রন্দন করা। শারীগানে অশ্লীলতা রহিয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যে রুচিবিকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ধর্ম্মমঙ্গলে যে সামাজিক ধারার পরিচয় পাই শারীগানের মধ্যে তাহার শেষ রেশ রহিয়াছে। শারীগান নৌকা বাইচের সময় গীত হয়।

জাগ গানও গীতি কবিতা পর্যায়ের। জাগগান সাধারণত রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পৌষমাসে গীত হয়। জাগ গানের অনুরূপ গান ঢাকা, নোয়াখালীতে প্রচলিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি। ঐ সকল জেলায় ভ্রমণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই।

ভাসান গান এখন উঠিয়া যাইতেছে। বহুদিন হইল কোথাও এই প্রকার গান কোন পল্লীতে শুনি নাই। যে সকল ভাসান গান বাঙালার পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলে প্রাচীন মনসামঙ্গলের গানের সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের সুবিধা হইত।

ভাসানের অনুরূপ গান রংপুর জেলায় প্রচলিত আছে, উহা বিরা গান নামে কথিত খাজা খেজেরকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

কবিগান এককালে বাঙলার খুব প্রিয় ছিল। হিন্দু মুসলমান গ্রামবাসী একত্র একভাবে উহার রস উপভোগ করিত। এখন আর সে ভাব নাই। কবিগান আমরা সংগ্রহ করি নাই, উহা সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাপেক্ষ। কেহ ইহা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিলে যশ পাইবেন নিঃসন্দেহ এবং বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত দিক আলোতে উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। জনৈক গ্রন্থকার কবিগানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু উহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ।

কবিগান কোন্ সময় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে আমাদের মনে হয় ইহা মুসলমান কবিদের মুশায়েরার অনুকরণে সৃষ্ট। মুশায়েরায় পারশ্য কবিদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ রচনার পরীক্ষা হয়। সংকীর্তনের অধিক প্রচলনের জন্য কবিগান ও অন্যান্য পল্লীগান উত্তরকালে কোণঠাসা হইয়া পড়ে।

রামায়ণ এক সময়ে পল্লীগান পর্যায়ের সাহিত্য ছিল। কালক্রমে উহা সাহিত্য পদবী লাভ করিয়াছে; ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই রামায়ণ আখ্যায়িকার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। রাজশাহী জেলার চলনবিল অঞ্চলে এখনও পদ্মপুরাণ গীত হয় বলিয়া শুনিয়াছি। রংপুর জেলায় জঙ্গনামা প্রভৃতি কিতাব এখনও গীত হয়। আসামে এখনও রামায়ণ বাউল পর্যায়ের ভিক্ষুকগণ গাহিয়া থাকে এবং ডিব্রুগড় অঞ্চলে ঐ গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।

আমাদের প্রাচীন বাঙলা কাব্য সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থগুলিই যে গীত হইত এবং আমার যতদূর মনে হয় যে ঐ সকল গ্রন্থ পল্লীগান পর্যায়ের। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন বিদ্যাসুন্দরের মাল মসলা ভারতচন্দ্র পল্লীগাথা বা গল্প হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাচর্য বিনিশ্চয় পল্লীগান কি না তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা কিন্তু বাউলের লক্ষণ বলিতে যাইয়া ডক্টর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন চর্যাভাব বাউলের অন্যতম লক্ষণ। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের পর গোপীনাথের গান, ময়নামতীর গান, প্রভৃতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এমন কি বাঙলা সাহিত্যের যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনের কল্যাণে এই ময়নামতীর গান দেশবিদেশে আদৃত হইয়াছে।

বাঙলার অন্যতম সম্পদ ডাক ও খনার বচন গ্রাম্যগান পর্যায়ের জিনিস না হইলেও উহা যে ছড়া জাতীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সকল হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি পল্লীগান ও ছড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর ভারতের কাজরী জাতীয় গান আমাদের দেশে বোধ হয় নাই তবে মেয়েরা বিবাহাদির সময় গান গাহিয়া থাকে। ঐ ধরনের কতকগুলি গান এই গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। কাজরী গান গাহিয়া হিন্দুস্থানের মেয়েরা যে অনাবিল আনন্দ পাইয়া থাকে আমাদের দেশের মেয়েরাও তাঁহাদের মেয়েলী গান গাহিয়া তদপেক্ষা কম আনন্দ পান বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রাম্য মেয়েলী গান হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। নিরক্ষর মুসলমান চাষী গহস্থের

ঘরে এখনও বিবাহের সময় এই গান মাঝে মাঝে শ্রুত হয়। তবে দিন দিন এই প্রচলন রহিত হইয়া যাইতেছে। রংপুর জেলায় বিবাহের সময় নিরক্ষর মুসলমান চাষী গৃহস্থদেব মধ্যে প্রচলিত গান বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মেয়েবা দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে 'ফুরুল' ডুবায়। উহা বড়ই আনন্দজনক।

পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইটাকুমারের পূজা হয়। ইহা সাধারণত অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে বালক ও বালিকাবা এই পূজা করিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়েব লোকসাহিত্যে এই জাতীয় কতকগুলি গান দেখিতে পাওয়া যায়।

কৈবর্ত, জালিক প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পাট ঠাকুরের পূজার রীতি আছে। উহার সঙ্গে গান গীত হয়। জাগ গানে যেমন ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া গান করে এই পাট ঠাকুরের গানও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। এই গানে নৃত্যের প্রচলন আছে। উহা সাদাসিদে নাচ। মালদহের গম্ভীরা গান আমরা শুনি নাই, উহাতে নাচ আছে কিনা জানি না।

ইংরাজদের Folk dance জাতীয় জিনিস আমাদের বাঙলা দেশে আছে বলিয়া আমার মনে হয়, কিন্তু ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। Folk dance এবং Folk-song অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

গাজীর গানে আসল গায়েন নৃত্য করে, কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্য প্রচলিত আছে। ধুয়া, বারোমাস্যা প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যের কোন যোগ নাই। শারী গানের সঙ্গে অঙ্গ চালনা হয়, তবে নৃত্য পর্যায়ের নহে।

ময়মনসিংহের ঘাটু গানে গায়েন বালক নৃত্য করে বলিয়া শুনিয়াছি। আমরা কোন ঘাটু গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ময়মনসিংহে যে গাথাজাতীয় গান গীত হয় উহা গাজীর গানের অনুরূপ। আমরা নিজেরা ময়মনসিংহের গান গাহিতে শুনিতে পারি নাই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাথা সংগ্রাহক বন্ধুবর কবি জসীম উদ্‌দীন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং আমার অভিন্নহৃদয় জরীন কলম ঐ গান গাহিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি অতীব মূল্যবান চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের গান গাহিবার রীতির তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য উহা অত্যন্ত মূল্যবান।

ময়মনসিংহের গাথা জাতীয় গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়াও এই কথা নির্ভয়ে বলা চলে যে উহার মধ্যে যে রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাহা আমাদের অত্যুন্নত নাগরিক সাহিত্যের নীচে নহে। ময়মনসিংহের গাথা জাতীয় গানে সামাজিক ধর্মীয় নানাবিধ রীতি আচার অনুষ্ঠানের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। গাথা জাতীয় গানে অধিক লোকের প্রয়োজন। এইজন্য ইহা সমধিক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যুত গীতি কবিতা জাতীয় গানে বেশী লোক লাগে না। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে মাঝি নৌকার হাল ধরিয়া আপনার মনে যেমন "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না" গাহিতে পারে আবার বাউল ঘরের কোণেও উহা অনায়াসে গাহিতে পারে। উহার আনুষঙ্গিক কোন বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন করে না। বাদ্যযন্ত্র হইলেও চলে না হইলেও চলে। কিন্তু গাথা জাতীয় গানে বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

আমার হাতের কাছে কোন বহি নাই, সুদূর মফঃস্বলে পড়িয়া রহিয়াছি, পৃথিবীর অনান্য জাতির পল্লীগান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না বারান্তরে পারি ত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই গানগুলি সংগ্রহে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সংগ্রহের জন্য দু'কথা লিখিয়া দিয়াছেন এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই মহোদয় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের জন্য একখানি ছবি ও প্রচ্ছদলিপি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ীও অন্তরঙ্গ পীর-ই-মগাঁ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।*

শাহাজাদপুর
পাবনা
কাজরী, ১৩৩৬ সাল

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

* দক্ষিণ কলিকাতা উনবিংশ সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত। ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নাই বন্ধুবান্ধবেরাই সকল কাজ করিয়াছেন। আমি কেবল এগুলি একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণ যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই গানগুলির অধিকাংশই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, বঙ্গবাণী (অধুনালুপ্ত), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিন, বসুমতী, সম্মিলনী, তরুণ, প্রাচী (অধুনালুপ্ত), মাসিক মোহাম্মদী, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদকগণ ইহা প্রকাশ করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ না পাইলে এতগুলি গান সংগ্রহ করিতে পারিতাম না।

এই গ্রন্থ মুদ্রণব্যাপারে মেসার্স করিমবক্স ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলভী আবদুর রহমান খান সাহেব আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের বহিরঙ্গ পারিপাট্য বিষয়ে তাঁহার সহকারী কার্যসচিব বন্ধুবর মৌলভী কোরবান আলী খান, বি. এ. সাহেব যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত ছবিখানার ব্লক "প্রবাসীর" সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট মহাশয়ের চেষ্টায়ই ব্লকখানা তৈয়ারী হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী।

সুসাহিতিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী, শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, ডি-লিট, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সাহিত্যিক সাধুগণ এই গ্রন্থ প্রকাশে যদি আমাকে প্রবুদ্ধ না করিতেন তবে সাহস করিয়া ইহা ছাপাইতে পারিতাম না। এই গ্রন্থের দোষগুণের এবং আদর অনাদরের জন্য তাঁহারাই ও আমার অন্যান্য বন্ধুগণ দায়ী।

তরুণ-জামাত
কলিকাতা
১৩৩৬ সাল

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

ব র্ণা নু ক্র মি ক সূ চী প ত্র

অ

আ

ঝ

ত

দ

ধ

ন

ড

ঢ

প

য

র

শ

স

হ

বাউল গান

বাউল শব্দটা বাউর হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন। উত্তর ভারতের বাউর শব্দের সহিত আমাদের দেশের বাউলের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় বলেন, বাউল শব্দটি আউল শব্দজ, কেননা আমরা সাধারণতঃ আউল-বাউল বলি। আউল শব্দটি আরবী আউলিয়া সম্ভূত, আউলিয়া, ঋষি।

বাউলের জন্ম ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকির হইতে। ১৬শ' ১৭শ' ও ১৮শ' শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল। বাউল দলের সঙ্গে বৈরাগীদলের কোন সম্পর্ক নাই। বাউল দল তাহাদের নিজেদের গান ব্যতীত অন্য কোন গান গাহিত না ; কিন্তু অন্য লোকেরা বাউল গান গাহিত।

বাউলের লক্ষণ হইতেছে, সে মনের মানুষ খুঁজিতেছে। তাহার ধর্ম্ম হইতেছে, সহজ ভাব ; সে দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করে, এই দেহের মধ্যে চন্দ্র সূর্য আছে, জোয়ার ভাটা চলিতেছে। তাহার ভাব চর্য্যাভাব।

সে জীবনের ব্যবসায় হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। বাউলের মধ্যে মোটেই বৈরাগ্যের ভাব নাই। যদিও বা থাকে তাহা আছে শুধু মজা গ্রহণ করিবার জন্য মাত্র।

বাউল সম্বন্ধে বেশী কথা আমার জানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিভিন্ন ধরণের বাউল গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।'

(১) (ক) মনের মানুষ

* * * *

আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

* * * *

আমি মন পাইলাম মনের মানুষ পাইলাম না।
আমি তার মধ্যে আছি মানুষ তাহা চিনল না॥

* * * *

মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে, মানুষ হাওয়ার সনে রয়,
দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।
দেহের মাঝে আছে রে মানুষ ডাকলে কথা কয়।

* * * *

মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে।

* *

মনের মানুষ না হ'লে গুরুর ভাব জানা যায় কিসে রে

* * * *

আমি দেখে এলেম ভবের মানুষ ডোর—
কোপনি এক নেংটি পরা
সে মানুষ ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে কোন যে

বাউল গান

মণির মনোচোরা।
সে মানুষ ধরি ধরি
আশায় করি
সে মানুষ ধরতে গেলে না দেয় ধরা।

*　　*　　*

তরীতে আছে আটা-মণি কোটা জ্বলছে
বাতি রং মহলে,
সেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে
মন পবনে তরী চলে।

*

এই মানুষে আছেরে মন,
যারে বলে মানুষ রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন, পারলাম না চিনতে।

*　　*　　*

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনম ভর মিলে না।

*　　*　　*

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা,
অতি নির্জ্জনে ব'সে ব'সে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে র'য়ে ডাকে তারে, উচ্চৈঃস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যা যা বোঝে তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা,
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেই খানেতে ডলা মলা
ওরে তেমনি জেনে মনের মানুষ মনে তোলা।

যে জন দেখে রূপ করিয়ে চুপ রয় নিরালা,

ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানানো হরি বোলা,

মুখে হরি, হরি বোলা,

*   *   *

অটল মানুষ বইসা আছে, ভাব নাইরে তার চুপ রে চুপ।

*   *   *

(খ) মনের মানুষের পর আমরা অচিন পাখীর খবর পাই। ইহাও বাউলের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী

কেম্‌নে আসে যায়।

*   *   *

মনের মনুরায় পাখী গহীনেতে চড়ে রে

নদীর জল শুখায়ে গেলে রে

পাখী শূন্যে উড়ান ছাড়েরে

মাটির দেহ ল'য়ে।

*   *   *

আমার মন পাখী বিবাগী হ'য়ে

ঘুরে মরো না।

(২) সহজ ভাবে সকল জিনিস গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা বাউলের একান্ত আপনার জিনিস। অন্যের সঙ্গে তাহার এই স্থানে বিশেষ পার্থক্য :

সুখ পা'লে হও সুখ ভোলা,

দুখ পা'লে হও দুখ উতালা,

লালন কয় সাধনের খেলা,

মন তোর কিসে জুৎ ধরে ?

(৩) বৌদ্ধ সিদ্ধাগণের চর্য্যা যে ধরণের রচনা, বাউল গানও তদ্রূপ রচনা। জীবনের নানা ব্যবসায় (Occupation) অবলম্বন করিয়া

গান রচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই রীতির কয়েকটি গান তুলিয়া দিতেছি :

গড়েছে কোন সুতারে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে,
ধন্য তার কারিগরী বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে।
দেখিনা কেবা মাঝি কোথায় বসে, হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে।
তরীটি পরিপাটি মাস্তলটি মাঝখানে তার বাদাম ঝোলে,
লাগে না হাওয়ার বল এমনি সে কল সকল দিকে সমান চলে।
তরীতে আছে আটা মণি কোঠা জ্বলছে বাতি রংমহলে
যেখানে মনের মানুষ বিরাজ করে মন পবনে তরী চলে।
সখিন কয় হলে ঝড়ি তুফান ভারী উঠবেরে ঢেউ মন সলিলে,
যেদিন ভাঙ্গবেরে কল হবে অচল চলবে না আর জলে স্থলে।

* * *

পদ্মা নদীর পুল বেঁধেছ ভাল,
কত ইট পাটকেল খাপ্‌ড়া কুচি পদ্মার কূলে দিল,
কত জায়গার মানুষ ঐ ডাঙ্গাতে ম'ল,
পুলের থাম্বা ষোল জোড়া,
উপরে তার গিল্‌টি করা,
কাঁকড়া কলে মাটি তুলে থাম্বা বসাইল।
মেম সাহেবের বুদ্ধি খাসা,
পুল বেঁধেছে বড় খাসা।
ষোল জোড়া থাম বসাতে তিনজন সাহেব ম'ল।
চৌদ্দশ কুলীর মধ্যে নয়শ কুলী ম'ল।
পুলের খরচ মোটামুটি
টাকার খরচ সাত কোটী
আমার ক্যাপা চাঁদের কি কারখানা বুঝতে জনম গেল! *
("বিচিত্রা" জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

---

* মাজুতে বঙ্গীয় অষ্টাদশ সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত। এই প্রবন্ধ লিখিতে আচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের নিকট অনেক উপদেশ ও সাহায্য পাইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ

পল্লীগান বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা। বাঙ্গালীর যখন স্বাস্থ্য ছিল, বাঙ্গালী যখন কেরাণীগিরির প্রলোভনে হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত না, বাঙ্গালীর অন্তর-অকাশ যখন আনন্দের বিকাশে ও নির্ম্মলতায় পূর্ণ ছিল তখনকার এই সম্পদ, এই আনন্দের দান, এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত গান নানাবিধ কষ্টের মধ্য দিয়া অতি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়াছি, এবং বাঙ্গালী সভ্যতার বিকাশের উপর ইহার যে কত ছাপ রহিয়াছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। মানুষের মন যখন ভয়-ভাবনাহীন থাকে, যখনই অন্য কোন প্রকার চিন্তাকীট দ্বারা তাহার হৃদয়পল্লব জর্জ্জরিত হয় না, যখনই তাহার মন আনন্দে বসরা গোলাপের মত বিকশিত হয় তখনই তাহার সুঘ্রাণ, তাহার মাধুর্য্য রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে আসে অর্থাৎ কবি ও শিল্পীর অতুল তুলির পরশলাভ করিয়া ধন্য হয়। সত্যই জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন **"Poetry is the most intense expression of the dominant emotions and the higher ideal of age"** এবং আরও নজির-স্বরূপ **Blair**-এর কথায় বলা যাইতে পারে **"Poetry is the language of emotions"** (এই রকম অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। সুতরাং নজিরের ভারে আসল জিনিসের কথা চাপিয়া রাখিতে চাই না।) মানুষের মন যখনই আনন্দের বেদনায় মুহ্যমান হয় তখনই সে

আনন্দদায়ক নব সৃষ্টি করে ; আর আনন্দের বিকাশ বলিয়াই ইহা চিরন্তন হইবার দাবী রাখে।

(২)

বাঙ্গালী সভ্যতা (দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়) হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজ সভ্যতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সৃষ্টি। বাঙ্গালী সভ্যতার মধ্যে এই সব সভ্যতার ছাপ আছে, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আর এই ছাপ সাহিত্যে বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু সভ্যতা এই বাঙ্গালী সভ্যতার মূল, বৌদ্ধ সভ্যতা ইহার কাণ্ড, মুসলমান সভ্যতা ইহার শাখা-প্রশাখা এবং ইংরেজ সভ্যতা ইহার পত্র-পুষ্প-বিকাশ।

মুসলমান সভ্যতার ছাপ যে এই পল্লীগানে লাগিয়া রহিয়াছে তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যাইবে। আরবী এবং ফারসী শব্দ সমূহই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আর তাহা ছাড়াও ভাবের রাজ্যে ইহার প্রতিপত্তি দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি গানের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করা যাউক।

'আল্লা কুদরতের পর খেয়াল কর মন ॥
একতনে হয় পাঞ্জাতন
কোন তনে আছেন আল্লা নিরাঞ্জন ॥
কোন তনে হয় মাতা পিতা,
কোন তনে হয় মুরশিদ ধন ?
আল্লার কুদরতের 'পর খেয়াল কর মন !!"

এই গানের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ মুসলমানী। 'তন' পারশী শব্দ, অর্থ শরীর। মুসলমানের tradition-এর সাথে পরিচয় না থাকিলে ইহা সহজে বোধগম্য হওয়া কঠিন এবং ইহার expressive কবিত্ব শক্তি ও association উপলব্ধি করা যায় না।

যাঁহারা এই সমস্ত গান রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্তরের মাধুর্য্যও ইহাতে রূপ পাইয়াছে। একটি গান পারস্য কবি-কুল-প্রদীপ মওলানা জামী (রহমতুল্লা আলায় হে) র একটি কবিতার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। যথা :—

"মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জান গে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়॥
যে জন জেন্দা লয় খেলকা কাফন,
দিয়ে তার তাজ তহবন,
ভেক সাজায়॥
মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়॥"

জামী

"মাও তু জে খাকেম্ ও খাক আজ জমি,
হাম বেহ্ কে খাকী বুওয়াদ আদমী"।

'আমি এবং তুমি মাটি হইতে সৃষ্ট, যদি মাটির মত হও তাহা হইলেই তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশ পাইবে।' ঠিক এইভাব লইয়া পারস্য কবি-কুল-তিলক ঋষি হজরত মওলানা সাদী (রহমতুল্লা আলায়হে) অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন দেশীয় অনেক নামজাদা কবির ভাবের সহিত এই সমুদয় অখ্যাত নামা ও অজ্ঞাত কবিদের রচনার ভাব একেবারে মিলিয়া যায়।

এই ত গেল ইহার সোজা দিকটা। এখন ইহার জটিল আধ্যাত্মিক দিকটার সামান্য একটু আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনা বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইবার আশা যাঁহারা করেন, তাঁহারা নিতান্তই নিরাশ হইবেন। এই কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে এই গূঢ় আধ্যাত্মিক দেশের কথা মৌলবী সাহেবেরা যাহাকে তাহাকে শিখান না এবং যে সে শিখিবার উপযুক্ত পাত্রও নহে, তবু কেমন করিয়া এই 'অক্ষর'-

জ্ঞানহীন ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এই স্থানে একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

জপরে তার নামের মালা না হয় যেন ভুল
গাঁথ ঐ নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা,
অন্ধকার হবে উজ্জালা,
এই দুনিয়ার মূল।
তুমি লায়লাহা ইল্লাল্লা বল,
ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
এই ভবের হাটে ভুল না রে মহম্মদ রসুল।
নুহ্ অল ইস্‌বাত নফুয়াল নবি,
ও তোমার ফানা ফাল্লা যখন হবি,
মেছের শা কয় তবে হবি,
আল্লার মকবুল ॥"*

---

* এই গানটি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমুদয় টীকা টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে উদ্ধৃত করিতেছি। কর্তৃপক্ষের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল বসু এম. এ. মহোদয়কে তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(১) লায় লাহা ইল্লাল্লা—আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই।

সাধানাকালে হিন্দুগুরু যেমন শিষ্যকে বিশ্বের সর্বত্র "ওঁ" ধ্যান করিতে উপদেশ দেন, পীর সাহেবরাও তেমনি ভিতরে বাহিরে এই কল্‌মা (মন্ত্র) জপ ও ধ্যান করিতে বলেন। প্রথমেই অবশ্য এই কল্‌মা জপ করা হয় না। প্রথম শুধু "আল্লাহ"—এই কথাটি মনে মুখে জপ করিতে হয়। যে নিয়মে এই সব ধ্যান করিতে হয়, তাহা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ নিষিদ্ধ।

(২) নুহ্ অল ইসবাত, 'নফি ইস্‌বাত' কথার অপভ্রংশ। ইহার ভাবার্থ 'লায়লাহা ইল্লাল্লা' দ্বারা নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কল্পনায় সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মের অসীম সৌন্দর্য্যময় অস্তিত্ব অনুভব করা।

বন্ধুবর মৌলবীর রজব আলী সাহেব প্রদত্ত পাদটীকা হইতে ইহার সোজা মানে বোঝা যাইবে। সত্য উপলব্ধি করিলে যে ভাব মানস মন্দিরে জাগে, ঠিক এই ভাব লইয়া ইহা লিখিত। 'ঐ আঁধার কাটে চক্ষু মেল'—সেই উপলব্ধির উজ্জ্বল বর্ণনা আমাদের সামনে আনিয়া দেয়। সাধকের সাধনা সফল হইল—তিনি গভীর অন্ধকার রজনীর অবসান দেখিতেছেন—পূর্ব আকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশের পূর্ব আভাষ পাইতেছেন। এই গানটি পল্লী সঙ্গীতের অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি।

আরও একটি গান পাঠকের সামনে নজীর দেওয়া যাউক :

"নবি দিনের রছুল, আল্লার নাম হয় না যেন ভুল।
ভুলে গেলে মন পড়বি ফেরে হারাবি দুকূল ॥
আওয়ালে আল্লার নূর, দুইয়ামে তোবার ফুল
ছিয়ামে ময়নার গলার হার,
চৌঠা ছেতারা, পঞ্চমে ময়ূর ॥
আব, আতস, খাক বাতাসের ঘরে
গড়েছেন সেই মালেক মোক্তার, চারচিজে।
চারচিজে একমতন করে, দুনিয়াই করেছে স্থূল ॥

(৩) নফুয়াল নবি, 'নফিয়ন্নবি' শব্দের অপভ্রংশ। ইহার আর এক নাম "ফানাফির রছুল" অর্থাৎ রসুলোল্লার (হজরত মুহম্মদ দঃ) ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

(৪) ইসলাম ধর্মমতে আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তকে সাধনার তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ 'ফানাফিসেখ' বা আপন পীরের সহিত লয়প্রাপ্তি। সত্য সনাতন নিরাকার সদাপ্রভুর দর্শন লাভ আকাঙ্ক্ষায় অদৃশ্য পীরের ধ্যান করিতে হয়। পীর ভক্তের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য লাভের সহায় মাত্র। প্রথম স্তর অতিবাহিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই সিদ্ধিলাভের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সহায় রসুলোল্লার ধ্যান করিতে হয়।

এই ভণিতাহীন কবিতায় মুসলমানী ভাবেরই সমাবেশ। ইহার পরিভাষা (Technicalities) না বুঝিতে পারিলে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে।

এইখানে আর একটি গান উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই গানে সৃষ্টির কথা আছে। হিন্দুর যেমন 'শব্দব্রহ্ম' ও ইংরাজের যেমন "Let there be light" বলার সাথে সাথে এই সৃষ্টি, মুসলমানেরও তেমন "কুন্" (অর্থ হও বা কর) শব্দ হইতে সৃষ্টি। (পয়গম্বর কাহিনী—মৌলবী ফজলুর রহিম চৌধুরী এম, এ, দ্রষ্টব্য) এবং সেই কথাই এখানে বলা হইতেছে।

"আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে।
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, তিন জনা এক নুরেতে নূরেতে ॥
সে সাগর, অকূল আদি, অন্ত নাই তার নিরবধি,
নিঃশব্দ ছিল সিন্ধু আদিতে ॥
শব্দ হইল কুন্, জান তার বিবরণ,
হুয়াল আছমা কারিগরিতে ॥"*

ইহার নাম "ফানাফির রসুল"। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রম 'ফানাফিল্লা' অর্থাৎ আল্লাতে মিলিয়া যাওয়া। বহির্জগতে ও আত্মিক জগতে যাহা কিছু সবাই গানে বিভোর। এই স্তরে উপস্থিত হইলে, সাধক আত্মজ্ঞানহীন হইয়া মহর্ষি মনসুরের ("মহর্ষি মনসুর" কবি মোজাম্মেল হক প্রণীত দ্রষ্টব্য।) মত 'আনাল্ হক" বা অহং ব্রহ্ম বলিতে থাকেন। অনন্ত জ্ঞানময়ের সহিত মিশিয়া গেলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কি করেন, কি বলেন, সে জ্ঞান তখন তাঁহাদের থাকে না—কেহ পাগল বলে, কেহ ভণ্ড বলে কোন দিকেই দৃকপাত করেন না। সাহাজাদী জেব-উন্-নিসা বলেন :

ছারে জং আসত বা মজ নুনে আজ আহলে শরিয়ত রা।
কেদর দরহে মহব্বত নোক্তায়ে বা হার ছোখন গিরাদ ॥"

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য একটি গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি পাঠক একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের সুর গানে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, অন্যত্র ত দূরের কথা। বাঙ্গালা সমাজতত্ত্বের ইতিহাস লিখিত হইলে এই সব বুঝিবার আরও সহজ পন্থা উদ্ভাবিত হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলন কতটুকু হইয়াছিল তাহা এই গান হইতেই বুঝিতে পারিবেন; হিন্দু ও মুসলমান tradition এর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সম্পদ সৃষ্ট হইয়াছিল।

'মাবুদ আল্লার খবর না জানি।
আছেন নির্জ্জনে সাঁই নিরঞ্জন মণি,
সেথা নাই দিবা রজনী॥
অন্ধকারে হিমাস্ত বায় ছিলে আপনি,
সেই বাতাসে গৈবী আওয়াজ হ'ল তখনি॥
ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গড়লেন রব্বানি॥
ডিম্ব রক্ষে আলে, ডিম্বের খেলা আদমে খেলে,
অধীন আলেক বলে না ডুবিলে কি রতন মিলে?
ডুবিলে হবে ধনী॥"

ইংরেজ সভ্যতার ছাপ "শিক্ষিত সাহিত্যে" যত লাগিয়াছে পল্লী সাহিত্যে তত লাগে নাই! আর পল্লী সাহিত্যে যতটুকু লাগিয়াছে তাহা ইহার বাহিরের জিনিস—অর্থাৎ সভ্যতার কলকব্জা আসবাব পত্রের কথা। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী সভ্যতার কলকব্জার আমদানী বেশী ছিল না, কাজেই ইংরেজ সভ্যতার বাহিরের দিকটাই পল্লীগানে বেশী দাগ কাটিয়াছে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বাহিরের আসবাব-পত্র নৌকা, চরকা প্রভৃতি ছিল সুতরাং এই সব লইয়া সুন্দর সুন্দর গান দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বর-প্রেম পথের পথিকেরা প্রেমাভিশক্ত জ্ঞানহীন। সাধারণ লোকেরা কিছু না কিছু বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অন্যায়রূপে গালি দেয়। অথবা তর্ক করিতে যায়।

(৫) মকবুল, বন্ধু=প্রিয়।

—মৌলবী রজব আলী, বি,এ.

দ্রষ্টব্য :—The Edward College Magazine : Vol. I. No. I. Pn. 12-13

আমাদের ঘরের জিনিস চরকা লইয়া সাধক কি আত্মতত্ত্বে উপস্থিত হইয়াছেন দেখা যাউক। সাধারণ নিজের মনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:

"যা যা তেল দিগে যা আপন চরকাতে।
ভোলা মন ভুলিস না তুই কথাতে।
চরকার অষ্ট পাখী,
দুই ধারে দুই প্রধান খুঁটি,
মাঝখানে দুই চাকী
কত কালে ঘুরছে (রে মন)
চরকা ঘুরে কেবল মালের জোরেতে।।"

এই চরকার সাথে বাঙ্গালীর কত সুখ দুঃখের কথাই না জড়িতে রহিয়াছে!

বাঙ্গালী সভ্যতার অন্যতম গৌরবের জিনিস বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন যাহাতে তৈয়ারী হইত সেই তাঁত হইতেই বা সাধক কি আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, দেখা যাউক। মনকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন শুনুন:

"মন তাঁতী কি বুনতে এলি তাঁত।
এসে প্রথমেই হারালি আঁত।।
ও তোর সানার সুতো মানায় না তোরে,
পোড়া পোড়েন হ'ল জাত।।
করে আনাগোনা তানা কাড়ালি,
হায়, তুল্লি কি খেই হায়
ঘুচলো না খেই কোচ্‌কা পড়ালি।।
যত আনাগোনা যায় না গোনা রে
হলো সকল তোর ভস্মসাৎ।।
পেয়ে এমন তানা জানলি আপন কিসে
তাই ভাবি রে, ভাবি রে মনের হুতাশন।।"

এর যে রটনা টানা আর খাটে না রে ;
যে তোর পাছ লেগেছে হয় বজ্জাৎ॥
যত আশা করি তুলাতে গেলি ঝাঁপ দিলি,
এককালে চিরকালে, পাপ সলিলে ঝাঁপ !।
ভেবেছিস্ এবার উঠবি আবার রে ;
ক্রমে ক্রমে হল অধঃপাত॥
হাতে গলে সুতা জড়ালি কেবল।
এলে রবিসুত এ সব সুতো কোথায় রবে বল॥
ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে'
যদি খাবি দীন বাউলের ভাত॥"

এই সমস্ত গানের মাধুর্য উপলব্ধি করিবার। গানের প্রভাব যে মানব মনের উপর কত বেশী তাহা না বলিলেও চলে। যখন এই সমস্ত গান গীত হয় তখন শ্রোতৃগণের মন সংসারের নীচতা হইতে বহু উর্ধ্বে উঠিয়া যায় ? এই সমস্ত গানের জন্যই বাঙ্গালী জন সাধারণের **Moral Standard** এখনও অনেক উচ্চে আছে।

এখন বাঙ্গালীর তরী সম্বন্ধে সাধকের রূপক গান দেখা যাউক। বাঙ্গালী যে বাণিজ্যপ্রিয় জাতি ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীমন্ত সওদাগর চাঁদ সওদাগর ও এই সমস্ত পল্লীগান। 'মহাজনের 'মাল' লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন এই ভাবটা অনেক পল্লীগানেই আছে। ছয়জন 'বোম্বেটে' সেই সমস্ত কাড়িয়া লইয়া যায়। (এই বোম্বেটের তুলনা কি পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের কার্য্য কলাপ হইতে গৃহীত ? "বোম্বেটে" শব্দ কতদিন হইল আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে ?)

তরী সম্বন্ধে অনেক গান আছে। তুলনামূলক সমালোচনার জন্য কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।

(ক)

"গড়েছে কোন সুতারে এমন তরী জল ছেড়ে ডাঙ্গাতে চলে।
ধন্য তার কারিগরি বুঝতে নারি এ কৌশল সে কোথায় পেলে।
দেখি না কেবা মাঝি কোথায় বসে হাওয়ায় আসে হাওয়ায় চলে
তরীটি পরিপাটি মাস্তলাটি মাঝখানে তার বাদাম ঝোলে॥
লাগে না হাওয়ার বল এমনি সে কল সকল দিকে সমান চলে।

তরীতে আছে আটা মণি কোঠা জ্বলছে বাতি রংমহলে,

যেখানে মানের মানুষ বিরাজ করে মন পবনে তরী চলে।
সখিন কয় হলে ঝড়ি তুফান ভারি উঠবেরে ঢেউ মন সলিলে,
যেদিন ভাঙ্গবে রে কল হবে অচল চলবে না আর জলে স্থলে।"

(খ)

"দিনের দিন বসে রে শুনি।
কোন দিন যেন টলিয়ে পড়ে আমার সাধের তরণী॥
কোন জোয়ারে ভরলেম ভরা,
সে জোয়ার গিয়েছে মারা,
শেষ জোয়ারের ভাটায় পড়ে করছি টানাটানি॥
সে জোয়ার কোন দিন পাবো,
সাধের তরণী জলে ভাসাব,
ব'লে জয় রাধার নাম ধ্বনি॥
একে আমার জীর্ণ তরী,
তাতে মাল্লারা 'কলা' ভারী,
মুখে বলে হরি হরি অন্তরে শয়তানী॥
দাঁড়ি মাল্লা যুক্তি করে,

সাধের নৌকায় নেয় কুড়াল মেরে,
পার হব কেমনে ত্রিবেণী ॥
তক্তার "বা'ন" ছুটেছে,
সাধের তরণী "খোঁচে" বসেছে,
কোনখানে কারিগর আছে ঠিকানা না জানি ॥
গোঁসাই নলিন চাঁদ বলে,
কারিগর আছে নিরালে,
খুঁজলে পরে মিলবে রে অখনি ॥"

(গ)

"আজব তরী দেখে মরি গড়েছে কোন মিস্তিরী,
এ তরী বোঝাই নেয় ভারী, তিন বেলাতে বোঝাই করি,
তবু বোঝাই হয় না ভারী মন ব্যাপারী।
তরীর ভাব দেখে সদাই আমি ভাব্যা মরি।
তরীর মাল্লা আছে ছ'জনা,
তিন জনে খাটায় তরীর কল,
আর তিন জন আছে বসে তরীর পর।
আমি যে দিন টানতে কই সে দিক টানে না,
তারা সদাই করে জঞ্জাল, বাধায় গোল মাল,
কোন দিন যেন সাধের তরী শুকনাতে হয় তল।
ছয় জনাতে ঐক্য মিলে তরী যাও বায়ে,

---

* নৌকার তক্তার সংযোগস্থল জীর্ণ হইয়া তাহার মধ্য দিয়া নৌকায় জল প্রবেশ করে। তক্তার 'বান ছুটেছে', অর্থাৎ তক্তার সংযোগস্থল অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, কাজেই জল উঠিয়া ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

তবু তার পাড়ি নাহি জমে যে দিন 'বান' চুয়ায়ে
উঠবে পানি !
যে দিন তরী মন রসনা নৌকা ছেড়ে পালায়ে যাবে
মাল্লা ছয় জনাই।

(ঘ)

"কোন কারিগর গড়েছে তরী।
ও তার গুণের (মন রে)
ও তার গুণের যাই বলিহারি ॥
তরী দমের গুণে, জলে আগুনে,
চল্‌তেছে অনিবারে।
সদাই তুইটি চাকা তুইদিকে ঘোরে ॥
আবার, মাঝখানে তার নড়ছে তার
দেখ সে কল ঘুরে ॥
কিবা হাল ধরেছে (ভোলা মন) দিবারেতে
বসে আছেন কাণ্ডারী ॥
বসে এক খালাসী মাপ্‌ছে নদীর জল।
তু'জন তার তুধারে দুরবীণ ধরে
হায় কি মজার কল ॥
আবার তু'জন কেবল কয়লা আর জল
যোগায় জল বরাবরি।
কিবা, তুইটি নলে সদাই দম চলে।
কয়লা জল বদলাবার নালা আবার রয়েছে তলে,

* নৌকার তক্তার অল্প পরিমাণ স্থান নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার মধ্য দিয়া জল উঠে। এই অবস্থার নাম "খোঁচ"।

এই দুই ছত্রে নৌকার জীর্ণতা ও ধ্বংসমুখতা—ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

তার উপর-পানে কেউ না জানে

লাট সাহেবের কুঠুরী।

এখন কলের বলে যাচ্ছে ঢেউ ঠেলে।

যখন আড়াবে কল, তলিয়ে সকল, যাবে এক কালে।

ডেকে কোটাল, সে বিষম কাল,

আর ক্ষণকাল নাই দেরী॥

মিছে এ তরীর ভরসা করা।

এমন কত শত অবিরত, পড়ছে মারা।

এ দীন বাউলে কয় (ও ভোলা মন)

তার কিরে ভয় সদয় যার শ্রীহরি॥"

[এই গানটি যে আধুনিক রচনা তাহা ইহার ভাব ও ভাষা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায়]।

তরী সম্বন্ধে আরও অনেক গান আছে। আমি দুই চারিটি মাত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পাঠকের বিরক্তির ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আরো সুন্দর গান আছে। মহাজনী ব্যবসা বিষয়ে বেশ একটি সুন্দর গান পাঠকের সামনে হাজির করিতেছি। এই গানে বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রবণতার ছবি আমাদের সামনে ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গালীর এখন যে ব্যবসার নামে মনে আতঙ্ক উঠে পূর্ব্বে তাহা মোটেই ছিল না।

"কও মন তুমি কিসের মহাজন,

করলে এতোদিন কি উপার্জ্জন।

যত বিলাত বাকী, মজুত বাকী করেছ কি নিরূপণ॥

আপন পাওনাটি বেশ বেশ দেখেছো হিসাবে।

কিন্তু দেনার বেলায় পড়বে ঘোলায়,

জ্বালায় প্রাণ যাবে॥

যে দিন হবে নিকেশ, রবে কোথায় এ ধন-জন ॥
ও কি বাকী সদায় করতেছো আদায়,
আস্‌ছে হাল তাগাদায়, কাল পেয়াদায়,
ভাব্‌ছো না সে দায় ॥
তারে গোঁজা দিয়ে প্রবোধিয়ে,
পারবে কি ভোলাতে,
ওরে বস্তা ভরে করছো কিরে মাপ।
পরের ওজন কমি, ধরছো তুমি,
লয়ে দু'জন মুটে, লুটে পুটে,
সারলো সে মোকাম ॥
যবে আর কি ছিল মাল, সব দিয়েছো বিসর্জ্জন।
ছি ছি মহাজনী কর্ম্ম নয় এমন।
এ দীন বাউল তার কি টলে, তুচ্ছ লোভে মন ॥
ভবে সেই মহাজন করে যে জন শ্রীহরির চরণ ভজন ॥

বাউলের এক তারার সাথে খোলা মিঠে গলায় কি সুন্দর সুর শোনা যায় তাহা অনুভব করিবার, বুঝাইবার নহে। সুর ছাড়া গান, প্রাণ ছাড়া দেহ।

বাঙ্গালী যে ঘরে থাকে সে ঘর সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এইখানে সেই ধরণের একটি গান তুলিয়া দিতেছি।

"চার পোতায় এক ঘর বেঁধেছে ঘরামীর নাম সৃষ্টিধর।
আড়ে দীঘে একই প্রমাণ ঠিক সমান সে ঘর।
ঢাকা ঘরের মধ্যস্থল, মুর্শিদাবাদ সদর মোকাম,
কত গলি শোন বলি, চোষট্টি গলি চার বাজার ॥
কানা কালা বোবারই কারবার, দেখে শঙ্কা হয় আমার,
চার বাজারে চার দোকানদার করতেছে কারবার এসে।

দোকান মাথায় লয়ে চলে যায় কানা দেখে হাসে। *
কানার জিনিস কিনে বোবা ডাকে মালের মূল্য নিসে ॥
কানা কালা খেলছে খেলা, খেলছে নিশি দিবসে,
সংসারে অসার তারাই রসে আমি ভাব্যা না দিশে ॥
সেই ঘরে বসত করে জনমভরা একজনা,
চক্ষু নাই মুখ আছে কর্ণ দুটি কালা
নাকে না শোঁকে, চোখে না দেখে কানে না শোনে ক্ষামতা,
আমি অবিশ্বাসী ঈত্নু, সাধু জানে তা।
ছিল ঘরের আজ্ঞাকারী, "পিরভুয়ারী সবে মাথা' ?
ভাল মন্দ লাগে ধন্দ গন্ধ মালুম হয় যথা
মাতালে কি বুঝিতে পারে তা অপার মুখে কয় কথা ॥

বাগান সম্বন্ধে সাধকের গান দেখা যাউক। বাগান হইতে যে রূপক গ্রহণ করা হইতেছে তাহা অতীব মনোমুগ্ধকর।

"মন তুমি কি ছার বাগান করছো বাগান
আপন বাগান ছাপ রাখ না।
করে নিড়ানী হাতে দিনে রেতে
করছো বাগান মন রে কানা ॥
দেখ তোর ফুল বাগানে জঙ্গল হলো
নয়ন তুলে তাও দেখলে না।
বৃথা গাছ করে রোপণ জল সিঞ্চন
করে কি হবে বলো না।
দেখ তোর কল্পাতরু শুখাইল
সে তরুতে জল ঢাল না।
বাগানে কুড়িয়ে মাটি হলি মাটি
মাটি করলি সব সাধনা ॥

---

* গোরক্ষ বিজয় (পৃঃ ১৩৭-৩৮)

ছাড়রে ভবের বাগান মনরে পাষাণ
আনন্দ-বাগানে চল না।
সখিনচাঁদ মনের দুঃখে বল্‌ছে
যদি বাগান করতে হয় বাসনা।
দেখ তোর মন বাগাতে ফুল ফুটিল
গুরু পদ ঠিক রাখনা ॥"

বাঙ্গালীর স্নানের ঘাট সম্বন্ধেও কবির মনভোলান গান শোনা যাউক। সাধক বলিতেছে :

"সাম্‌লে ঘাটে নামিস্‌ আমার মন।
ঘাটেতে কাঁটা গোঁজা কত আছে,
হোস্‌ না রে তাতে পতন ॥
ঘাটেতে শেওলা ভারী, পা টিপে চলতে নারি,
কেমন করে নামবি তাতে, তার উপায় কর না ॥"

ঘাটের কথা ত শুনিলেন এখন "আঘাটা"র সম্বন্ধে শুনুন, ঘাট এবং আঘাটের তুলনায় পরস্পরের ছবি পরিস্ফুট হইবে।

"স্নান ক'রোনা আঘাটায়।
আরে পা পিছলে গেলে উঠা দায়।
মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায়,
যদি নেয়ে উঠিস্‌ বেঁচে পড়বি কেঁচে পুনরায় ॥
ভব নদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়।
কোথাও গড়ে হাঁটু পানি কোথাও হাতী তলিয়ে যায় ॥
নাব্‌লে পরে বাঁধা ঘাটে, আছে মজা কত তায়,
কত সাধু শান্ত হয়ে ভ্রান্ত, 'বেটকোরে' মারা যায় ॥
সে জানা বলে খোলা জলে, ঘাট কি অঘাট চেনা যায় ?
জেনে শুনে নাবলে পরে নাইক ক্ষতি তায় ॥"

এতক্ষণ বাঙ্গালীর গৌরবের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজ সভ্যতার ও বাঙ্গালীর অধঃপতনের কথাই বলিব। ইংরেজের কল কব্জার সমাগমেই কবি বলিতেছেন ঃ

"রসিক চিনে ডুবরে আমার মন।
রস ছাড়া রসিক বাঁচে না, জল ছাড়া মীনের মরণ॥
সে ঘাটে ভরিব জল,
সেই ঘাটে ইংরেজের কল,
ও সে কলসের মুখে 'ছাকনা' দিয়ে জল ভরে রসিক জন॥

ইংরেজ সভ্যতার প্রথম জিনিস আফিস—ব্যবসায়ের আফিস।

"কও হে কি কাজ করছো আফিসে।
আফিস 'ফেল' হবে কোন দিবসে॥
ভেঙ্গে রোকড় তবীল, করছো 'বিল',
ঠেক্‌তে হবে নিকেশে॥
এতো সামান্য পাঁচ কোম্পানীর আফিস
বিবাদ বাঁধলে পরে, দুদিন পরে, হবে 'এবলিস'।
সাহেব বিলেত যাবে, হায় কি হবে?
তুমি রবে কোন দেশে॥
যখন জানবে তুমি প্রধান অফিসার,
অমনি সর্ব্বনেশে, সার্জ্জেন এসে, করবে গেরেফতার॥
কে আর করবে তালাস, আসলো কি খালাস,
পাবে সে কালের পাশে॥
হায় হায় বিচার যখন করবে ম্যাজিষ্টের
এযে বাবুগিরি, কি ঝকমারি, তখন পাবে টের॥
ধরে দাগাবাজি, সে বাবাজী অমনি ধরবে ঘাড় ঠেসে॥
এ দীন বাউল বলে ও কাজে কাজ নাই।
এসো দয়াল হরি, আফিস তারি, সেই আফিসে যাই॥

কোন নিকেশের দায় নাইরে সদায় থাকবে সুখে স্ববশে ॥"

ইংরেজ সভ্যতার অন্যতম সামগ্রী, আমাদের দেশে নূতন ও অদ্ভুত সামগ্রী সেই গাড়ী সম্বন্ধে বাউলের গান দেখা যাউক।

"যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেল গাড়ী।
তোরা দেখ্‌সে আয় তাড়াতাড়ি ॥
উদ্ধারের আছে যত কল,
সকলের সেরা এ কল,
আপনি কলে তুলে দিচ্ছে জল,
হুহু উড়ছে ধোঁয়া, ঘুরছে বোমা,
আবার হচ্ছে কলের হুড়াহুড়ি ॥
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনীয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর,
মুখে হরি হরি গৌর হরি,
করছেন টিকিট মাষ্টারী,
ভক্তি টিকিট সাধন করে, ষ্টেশন বৈকুণ্ঠ পুরে,
যাচ্ছে বেদম দম দিয়ে কল ঘুরে,
কত হাজার প্রেম প্যাসেঞ্জার
পথে করতেছে দৌড়াদৌড়ি ॥
যে যেমন টিকিট করে, সেই কেলাসে তারে,
অমনি ভব ভুমে পার করে,
এ দীন বাউল ভণে, টিকিট কিনে,
'কোথা গৌর আমার লওহে' বলে,
কত যেতেছে গড়াগড়ি ॥"

হাসপাতাল হইতে কি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত গান হইতে বুঝা যাইবে।

তোরা আয় কে যাবি রে,
গৌর চাঁদের হাসপাতালে নদীয়াপুরে ।।
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলিকালে ম্যালেরিয়া জ্বরে ।।
কখন এমন ছিল না রে দেশে জীবের যন্ত্রণারে ।।
কল্লেন দাতব্য এক ডাক্তারখানা, দীনহীন তরে ।।
জীবন তারণ সাইনবোর্ডে লিখে রেখেছেন
দেখাতে লোকেরে ।
আন্‌ছেন রোগী ডেকে ডেকে তাদের জ্বর দেখে
দয়া থারমেটারে ।।

গাছ গাছড়া বেদ বিধি,
তার আরক তুলে করলেন বিধি
তারক ব্রহ্ম মহৌষধি,
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে ।।
নিতাই বাবু সিভিল সার্জ্জন,
য়্যাসিষ্টাণ্ট অদ্বৈত হল রে,
নেটিভ শ্রীবাস আর শ্রীনিবাস হরিদাস
আছে কমপাউণ্ডারে ।।
নিতাই বাবুর সুযশ ভাল,
জগাই মাধাই রোগী ছিল,
তাদের বৈষম্য জ্বর ছেড়ে গেল, একটি মিক্‌চারে ।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু, সাধুবাদ দুগ্ধ সাবুরে ।।
হরি কথা পাতিনেবু তাতে রুচি হ'লে অরুচি হবে,
গোসাঞি বলেন দিলাম বলে, অনন্ত ঐ ঔষধ খেলেরে ।
জ্বর যেতো তোর কপট পিলে যেতো একেবারে ।।"

এতদিন শুধু 'আফিস', 'রেলগাড়ী', 'হাসপাতাল', প্রভৃতির কথাই হইতেছিল। এখন ইংরাজ সভ্যতার চরম বিকাশ শাসনের কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হাকিম হও আমি হই চাপরাশী,
কনেষ্টবল হয়ে হাজির হই হুজুরে।
তোমার হুকুম জোরে, আইন জারী করে,
আনবো চোরকে ধরে, করে গেরেফ্‌তার ।।
ছিল পিতৃ বস্তু সত্য,
অমূল্য অসহ্য
হরে নিল তায় মদন আচার্য্য।
চোরের এমন কার্য্য দীনুর হয় না সহ্য।
মদন রাজার রাজ্য শুদ্ধ অবিচার ॥
কাম্‌ছে দেও না ক্ষমা, মত্ত হও দুবেলা,
'রুহুর' সঙ্গে মোহ মদনের খুব জ্বালা।
'কোরক' যেমন দোষী,
মিয়াদ দাও তায় বেশী,
মদনকে দাও ফাঁসি
কাম যাক দ্বীপান্তর ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত আত্ম-পরিজন,
সময়ের বন্ধু তারা অসময়ে কেউ নন।
দিয়ে চোরের সঙ্গে মেলা,
হ'য়ে মাতোয়ালা,
পেয়ে চাবি তালা,
ভাঙ্গলে আমার দ্বার ॥"

দেশের সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে পল্লীসাহিত্যের কি রকম পরিবর্ত্তন হয় তাহাই উপরি উদ্ধৃত গান-সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। এই আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত সুতরাং দুই এক জনের সংগৃহীত গান দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে না। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাহাই করিয়াছি। এই আলোচনা যে অসম্পূর্ণ তাহা সত্য কিন্তু তবু ইহা প্রকাশ করিতেছি কারণ এই প্রচেষ্টায় যদি অন্য কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন, বা স্বাধীন ভাবে বা যুক্ত ভাবে আলোচনা করেন। আমার বিনীত নিবেদন যে আমরা "বঙ্গীয় পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহ সমিতি" (**Bengal Folk-lore Society**) নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহিতেছি, যাঁহারা এই বিষয়ে উৎসাহী ও সহানুভূতিশীল তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া গ্রন্থকারের ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিলে সুখী ও অনুগৃহীত হইব।

(বঙ্গবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩১)

হারামণি

১

আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা,
অতি নির্জ্জনে বসে বসে দেখ্‌ছে খেলা।
কাছে রয়ে, ডাকে তারে উচ্চৈঃস্বরে কোনপ াগলা,
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক্‌রে ভোলা।
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত ডলা মলা,
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জন দেখে সেরূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা,
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক জানান হরি বলা,
মুখে হরি হরি বলা।

২

যে জন দেখছে অটল রূপের বিহার।
মুখে বলুক না বলুক সে থাকলে ঐ নেহার।
নয়নে রূপ না দেখতে পায়,
নাম মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার।
নেহারায় গোলমাল হলে,
পড়বি মন কুজনার ভোলে,

আখের গুরু বলে ধরবি কারে,
তরঙ্গ-মাঝারে ।
স্বরূপ রূপের রূপের ভেলা,
ত্রি-জগতে করেছে খেলা,
অধীন লালন বলে মনরে ভোলা,
কোলে ঘোর তোমার ।

৩

কোথা আছে রে দীন-দরদী সাঁই,
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর কর ভাই ।
চক্ষু আঁধার দেলের ধোকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই,
বসে নিগম ঠাঁই ।
এখানে না দেখলাম যারে,
চিন্‌বো তারে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখের তারে,
দেখতে যদি পাই ।
সুম্‌জে ভবে সাধন কর,
নিকটে ধন পেতে পার,
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁর,
বহু দূরে নাই ।

৪

মন আমার আজ পড়লি ফেরে,
দিন দিন পৈত্রিক ধন গেল চোরে ।

মায়া-মদ খেয়ে মনা,
দিবা নিশি ঝোঁক ছোটে না,
পাঁচ বাড়ীর উল হ'ল না কে কি করে।
ঘরের চোরে ঘর মারে মন,
যায় না ঘুম জানবি কখন,
একবার দিলে না নয়ন আপন ঘরে।
বেপার করতে এসেছিলি,
আসলে বিনাশ হলি,
লালন হুজুরে গেলে বকবি কিরে।

৫

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে,
তার জনম ভ'রে একবার দেখলাম না রে।
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে,
দেখতে পাইনে এ নয়নে,
হাতের কাছে তার,
ভবের হাটের বাজার,
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।
সবে কয় সে প্রাণ-পাখী,
শুনে চুপ চাপে থাকি,
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন।
কেউ বলে না একটা নির্ণয় করে।
আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা,
লালন বলে পর, বল পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ, আমি কিরূপ ওরে।

৬

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে,
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখব চক্ষেতে।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা,
পরে করে লেনা দেনা,
আমি হলেম জন্ম-কাণা না পাই দেখিতে।
রাজী হ'লে দরওয়ানি,
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি,
তারে বা কৈ চিনি শুনি বেড়াই কুপথে।
এই মানুষে আছে রে মন,
যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিন্‌তে।

৭

আমার আপন খবর আপনার হয় না,
আপনারে চিনলে পরে যায় অচিনারে চিনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না
আত্মা রূপে কর্তা হরি'
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি, ঠিকানা।
বেদ বেদান্ত পড়বি যত,
তাতে বাধবে তত লখ্‌না।
আমি আমি কে বলে মন,
যে জানে তার শরণ লে না,.

লালন বলে মনের ঘোরে,
হলেম চোখ থাকিতে কানা ॥

৮

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে,
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর,
এক পড়শী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি,
নাই কেনারা নাই তরণী, পারে।
তারে দেখব মনে বাঞ্ছা করি,
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কি সেই মানুষের কথা,
তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা, নাইরে।
সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
যম যাতনা সকল যেত, দূরে।
সে আর লালন একখানে রয়,
থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকরে।

৯

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে,
দেখো সে আপনি বাজায় আপনি মজায়
আপনি মজে সেই রবে।
নামটি লা-শারিকালা,
সবের শরিক সেই একেলা,
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা,
আপনি খাবি খায় ডোবে।

ত্রিজগতে যে রায়রায়াঁ,
তার দেখি ঘরখানি ভাঙা,
হায় কি মজার আজব রঙা,
দেখায় ধনি কোন ভবে।
আপনি চোর আপন বাড়ী,
আপনি সে লয় আপন বেড়ি,
লালন বলে এ নাচাড়ি,
কেন থাকি চুপে চাপে।

১০

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।
আপন খবর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধান্দায়।
আপনি সত্য না হইলে,
গুরু সত্য হয় কোন কালে,
আপনি যেরূপ দেখি নাই সেরূপ,
দীন দয়াময়।
আত্মারূপে সেই অধর,
সঙ্গী অংশ ষোল কলা তার,
ভেদ না জেনে বনে বনে,
খুঁজলে কি হয়।
আপনার আপনি চিনিনে,
ঘুরবি কত ভুবনে,
লালন বলে অন্তিম কালে,
নাইরে উপায়।

১১

এমন মানব জনম আর কি হবে,
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই,
দেব দেবতাগণ করে আরাধন,
জনম নিতে এই মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি,
পেয়েছ এই মানব তরণী,
লয়ে যাও ত্বরায়, তোর সুধারায়,
যেন ভরা না ডুবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্য ভজন,
তাইতে মানব রূপ গঠলেন নিরঞ্জন,
এবার ঠকলে আর না দেখি কেনার,
অধীন লালন কয় কাতর ভাবে।

১২

খুঁজে ধন পাই কি মতে,
পরের হাতে ঘরের কলকাঠি।
শতেক তালা আঁটা মালকুঠি।
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুড়ে,
সদায় তারা আছে জুড়ে,
দিয়ে জীবের নজরে
ঘোর টাটি।
আপন ঘরে পরের কারবার,
আমি দেখলাম না তার বাড়ী ঘর,
আমি বেহুঁস মুটে
কার মোট খাটি॥

থাকতে রতন আপন ঘরে,
একি বেহাল আজ আমারে,
লালন বলে রে মিছে,
এ ঘর বাটি ॥

১৩

চাঁদ আছে চাঁদ ঘেরা,
আজ কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা।
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তাহার মাঝে অধর চাঁদের আভা,
একবার দৃষ্টি ক'রে দেখি
ঠিক থাকে না অাঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা।
রূপের গাছে চাঁদ ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরনি লাগে,
দেখিস, দেখিস, পাছে হোস্‌নে জ্ঞান হারা।
আলেক নামে শহর আজব কুদরতি,
রেতে উদয় ভানু, দিবসে রাতি,
যেজন আলের খবর জানে দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে, সে চাঁদ দেখেছে তারা।

১৪

তোরা আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা,
মুড়িয়ে মাথা গলে কেন্তা কটিতে কৌপীন ধড়া।

গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই,
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছে কি ধন-হারা।
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে,
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলে কলিকালে
বেদবিধি চমৎকারা।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়
অধীন লালন বলে, ভাবুক হ'লে
সে ভাব জানে তারা।

১৫

পাগল দেওয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই,
বলি আমার আমার,
আছে কি ধন আমার,
সদায় মনে মনে ভাবি তাই।
দেহ-মন-ধন দিতে হয়
সে-ও ধন তারি, আমার তো নয়,
আমি মুটে মোট চালাই।
আবার ভেবে দেখি
আমি বা কি
ওগো, তাও তো আমার হিসাব নাই।
ও সে পাগলাবেটায় যে পাগলা খিজি

নয় সামান্য ধনে রাজি
কোন্ ভাবে কোন্ ভাব মিশাই।
পাগলার ভাব না জেনে
যদি যায় শ্মশানে
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই।
ও সে পাগল ভেবে পাগল হইলাম
সেই পাগলে কই স্মরণ হইলাম
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে,
আপনার আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমনি বাই।

১৩

বেদে কি তার মর্ম জানে,
সে-রূপে সাঁইর লীলা খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে।

পঞ্চ তত্ত্ব বেদের বিচার,
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে।

গোলে হরি বললে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়,
নীরে ক্ষীরে যুগলে রয়,
সাঁইর বারামখানা সেইখানে।

পড়িলে কি পায় পদার্থ,
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত,

লালন কয়, সাধু মোহান্ত,
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনি ॥

১৭

এমন, আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি,
কাল শমন এলে হবে কি।
ভাবিতে দিন আখের হ'লো
ষোল আনা বাকি প'লো
কি আলস্য ঘিরে এলো
দেখলিনে খুলে আঁখি।
নিষ্কামী নির্বিচার হ'লে,
জ্যান্তে মরে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় উসুল পাবে
জেনে উপায় কৈ দেখি ?
শুদ্ধ মনে সকলই হয়
তাও ত এবার জোটে না তোমায়
লালন বলে, করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণ-পাখী।

১৮

দেখনা রে ভাব-নগরে ভাবের ঘরে ভাবের কীর্তি,
জলের ভিতরে জ্বলছে বাতি।
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা,
ভাবে বসে দেখ নিরালা,
নীরেতে ক্ষীরেতে ভেলা
বয়ে জুতি।

জ্যোতিতে রতির উদয়,
সামান্যে কি তাই জানা যায়,
তাতে কত রূপ দেখা যায়
লালমতি।

যখন নিঃশব্দ শব্দের খাবে,
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে,
লালন কয়, দেখবি তবে
কি গতি।

১৯

সে লীলা ক্ষ্যাপা বুঝবি কেমন করে
লীলার যার নাইরে সীমা কোনখানে কোন রূপ ধরে।
আপনি ঘর সে আপনি ঘরী,
আপনি করে রসের চুরি,
(ঘরে ঘরে)
ও সে আপনি করে ম্যাজিষ্টিরী,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ী পরি,
গঙ্গায় রইলে গঙ্গা জল হয়,
গর্ত্তে গেলে কূপজল হয়।
(বেদ বিচারে)
তেমনি সাঁইএর বিভিন্ন আকার জানায় পাত্র অনুসারে।
একে বয় অনন্ত ধারা,
তুমি আমি নাম বেওরা,
(ভবের পরে)
অধীন লালন বলে, কেবা আমি জানলে ধাঁধা যেত দূরে।

২০

হতে চাও হুজুরের দাসী,
মনে গোল তো পোরা রাশি রাশি।
না জান সেবা সাধনা,
না জান প্রেম উপাসনা,
সদাই দেখি ইতর পনা,
প্রভু রাজি হতে কিসি।
বেশ করলে কি হয়,
রস বোধ যদি না রয়,
রসবতী কে তোরে কয়,
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি।
কৃষ্ণপদে গোপী সুজন,
করেছিল দাস্য সেবন,
লালন বলে তাই কি করে মন,
পারবি ছেড়ে সুখ বিলাসী।

(প্রবাসী, ১৩২২) সংগ্রহ-কর্তা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে,
চেয়ে দেখ না তোরা।
ফণি-মনি জিনি, রূপের বাখানি
ও সে দুইরূপে আছে একরূপ হলকরা।
যে অটলরূপে সাঁই,
ভেবে দেখ তাই,
নিত্যলীলা কভু,
সেরূপের নাই।
যে জন পঞ্চতত্ত্বরসে,
লীলারূপে মজে

সে জানে কি অটল রূপ কি ধারা।

যে জন অনুরাগী হয়,

রাগের দেশে যায়,

রাগের তালা খুলে

সেরূপ দেখতে পায়।

মহারাগেরই করণ

বিধি বিস্মরণ

আছে নিত্যলীলার উপর রাগ নিহারা।

ও সে রূপের দরজায়

শ্রীরূপ মহাশয়,

রূপের তালা চাবি,

তার হাতে সদা'

যে জন শ্রীরূপ গত হবে

তালা চাবি পাবে

ফকির লালন বলে অধর ধরবে তারা।

২২

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা।

'আহমদ' ১ 'আহাদ' ২ বিচার হলে যায় জানা।

আহমদ নামেতে দেখি,

মিম হরফ লেখেন নবি,

মিম গেলে আহাদ বাকী

আহমদ নাম থাকে না।

* উপান্ত।

১ হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর অন্য নাম।

২ খোদার নিরানব্বই নামের মধ্যে ইহা একটি। আরবীতে আহমদ লিখিতে আলিফ, হে, মিম ও দাল অক্ষর লাগে। আহমদ হইতে মিম হরফ বাদ দিলে আহাদ হয়।

যখন সাঁই নৈরাকারে,
ভেসেছিল ডিম্ব ওরে,
'আহাদে' মিম বসায়ে
'আহমদ' নাম হল সে না।

এই কথার অর্থ ঢোঁড়ে,
যার জ্ঞান বচ্ছে ধরে,
সব বলে লালন ভেড়ে
ফাক্‌রামি বই বোঝে না।

২৩

আয় গো যাই নবীর দীনে।
দীনের ডঙ্কা সদায় বাজে মক্কা মদিনে।
অমূল্য দোকান খুলেছে নবি,
যে ধন চা'বি সে ধন পাবি;
সে বিনা কড়ির ধন,
সেধে দেয় এখন,
না লইলে আখেরে পস্তাবি মনে।
তরীক ১ দিচ্ছেন নবিজী জাহের বাতনে ২
যথা যোগ্য লোক জেনে।
সে রোজা আর নামাজ,
ব্যক্ত এহি কাজ,
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে।

* হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে।

১ পথ, ইসলাম ধর্ম্মে সাধনার পথ চারিটি—শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফাৎ।

২ ব্যক্ত ও অব্যক্ত। আধ্যাত্মিকতাকে বাতুন পথ কহে, ইহা মারেফাতের অন্তর্গত। জাহের শরিয়তের অন্তর্গত।

নবির সামনেতে ইয়ার ছিল চারিজন। *
নূরনবী চারকে দিল চার যাজন।
নবি বিনে পথে,
গোল হল চারি মতে **
ফকির লালন যেন গোলে পড়িস নে।

২৪

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে
ওরে জ্বলছে একটা রূপের বাতি।
কে বোঝে কুদরতি খেলা,
জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা,
জানতে হয় সেই নিরালা
ওরে নীরেক্ষীরে আছেন জ্যোতি।
চুনি, মণি, লাল ও জওহরে,
সেই বাতি রেখেছে ঘিরে,
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে,
যে জানে সে মহারতি।
থাকতে বাতি উজ্জ্বলময়,
দেখ না যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে কখন কোন সময়
ওগো অন্ধকার হয় বসতি।

* হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত আলী (কঃ), হজরত ওসমান (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ)।

** মুসলমান ধর্মে চারিটি মজাহাব (ধর্মমত) আছে। হানিফী, হাম্বলী, শাফি ও মালেকী।

২৫

শুদ্ধ প্রেম-রাগে থাক্‌বের অবোধ মন।
নিভাইয়া মদন জ্বালা,
অহি তুণ্ডে কর মন খেলা,
উভয় নিহার উর্দ্ধ তালা
প্রেমরই লক্ষণ।
একটা সাপের দুইটি ফণী,
দুই মুখে কামড়ালেন তিনি,
প্রেম বাণে বিক্রমে
তার সনে দাও রণ।
মহারস যার হৃদ কমলে
প্রেম শৃঙ্গারে নাওরে খুলে,
আত্মা সামাল সেই রণ কালে,
কয় ফকির লালন।

২৬

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়।
রস রতি অনুসারে,
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয়।
লীলায় নিরঞ্জন আমার,
আধ লীলে করলেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়।

আপনার জন্মলতা,
জানগে তার মূলটি কোথা,
লালন কয় হবে শেষে
সাঁই পরিচয়।

২৭

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছেরে এ জগতে।
মুরশিদের চরণ সুধা,
পান করলে হরে ক্ষুধা,
কর না আর দেলে দ্বিধা,
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা,
বোঝ "অলিয়ম মুরশিদ" *
আয়েত লিখে কোরাণেতে।
আপনে খোদা আপনে নবি,
সেই আদম ছফি ;
অনন্তরূপ করে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদ রূপ ঐ ভজন পথে।
"কুল্লো সাইয়েন সহিত অল-আরস," *
"আলা কুল্লে সাইয়েন কাদির,"১
কেন লালন ফাঁকে ফের,
ফকিরি নাম বাড়াও মিছে।

* হে আমার প্রভু মুরশিদ।
* যাবতীয় পদার্থ খোদাতায়ালার 'আরশ' ঘিরিয়া রহিয়াছে।—কুরান।
১ সমস্ত জিনিসের উপর খোদাতায়ালার কর্তৃত্ব।—কুরান।
২ মওলা—উপাস্য ; —খোদাতায়ালা।

২৮

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে,
দেখ না রে সব হাওয়ার খেলা, হাওয়া বন্ধ হতে দেরী কি হবে।
থাকতে হাওয়ার হাওয়াখানা
মওলা ২ বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসে ছেরানায়, কখন যেন কু ঘটাবে।
বন্ধ হলে এ হাওয়াটি,
মাটির দেহ হবে মাটী,
দেখে শুনে হও না খাঁটি
মন কে তোরে কত বুঝাবে।
ভবে আসার আগে যখন,
বলেছিলে করব সাধন,*
লালন বলে সে কথা মন,
ভুলেছ এই ভবের লোভে।

২৯

প্রেমের সন্ধি আছে তিন,
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন।
প্রেম প্রেম বল্লি কিবা হয়,
না জানলে সেই প্রেম পরিচয়,
আগে সন্ধি বোঝ প্রেমে মজরে,
আছে সন্ধি স্থানে মানুষ অচিন।

* খোদাতায়ালা প্রথমে সমস্ত রুহকে এই জগতে পাঠাইবার আগে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের উপাস্য কে?' আত্মাগণ বলিয়াছিলেন "তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য এবং আমরা তোমার বান্দা।" বান্দার কাজ বন্দেগী করা। মানুষ মায়ায় ভুলিয়া মওলার উপাসনা ও আরাধনা করিতেছে না, ইহাই ফকিরের বক্তব্য।

পঙ্ক, জল, পল, সিন্ধু, বিন্দু,
আগু মূল তার শুক সিন্ধু,
ও তার সিন্ধু মাঝে আছেক পেঁচরে,
উদয় হচ্ছে রাত্রদিন।
সরল প্রেমিক হইলে,
চাঁদ ধরা যায় সন্ধিমূলে,
অধীন লালন ফকির, পায় না ফিকির,
হয়ে সদাই ভজন বিহীন।

৩০

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
রসের রসিক না হলে কি পাবে আর দিশে?
তালার উপরে তালা, তাহার ভিতরে কালা,
মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা,
শুধু রসেতে ভাসে।
"লামোকামে"* আছে নূরী ১
সে কথা অকথ্য ভারী,
লালন কয়, সে দ্বারের দ্বারী
নইলে কি জানত সে।

৩১

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না,
নড়ে চড়ে হাতের কাছে,
খুঁজলে জনম ভর মিলে না।
খুঁজি যারে আকাশ জমিন,
আমারে চিনি না আমি,
সে বড় বিষম ভ্রমের ভ্রমি,

* মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস যে "লামোকামে" আছে। "লামোকাম" অর্থ *non-space*, 'লামোকাম' বলিয়া কোন স্বর্গ বা স্থানের নাম নাই।

১ নূরী শব্দ নূর শব্দ হইতে উদ্ভূত। নূর অর্থ আলো, নূরী আলোময়।

সে কোন্ জন আমি কোন্ জনা।
হাতের কাছে হয় না খবর,
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর,
সিরাজ কয় লালন রে তোর
তবুও মনের ঘোর গেল না।

৩২

চাতক স্বভাব না হ'লে,
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মিলে।
চাতকের এমনি ধারা,
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা,
তবুও অন্য বারি খায় না তারা
মেঘের জল বিনে।
মেঘে কত দেয় রে ফাঁকি,
তবুও চাতক মেঘের ভুখি,
এরূপ নিরিখ রাখ্ রে আঁখি
সাধক তাই বলে।
মন হয়েছে পবন গতি,
উড়ে বেড়ায় দিবা রাতি,
অধীন লালন বলে গুরুর প্রতি
ও মন রয় না সুহালে।

৩৩

আমি সেই চরণে দাসের যোগ্য নয়,
নইলে মোর দশা কি এমন হয়।
ভাব জানি না প্রেম জানি না,
দয়াল দাস হ'তে চাই চরণে,

ভাব দিয়া ভাব মিলে মনে
হা রে দয়াল সেই যেন রাঙ্গা চরণ পায়।
দয়া ক'রে পদের বিন্দু,
দাও যদি হে দীনবন্ধু,
তবে তরি ভব সিন্ধু
নইলে না দেখি উপায়।
অহল্যা পাষাণী ছিল,
গুরুর চরণ-ধুলায় মানব হ'লো,
অধীন লালন পড়ে' র'লো
যা করে সাঁই দয়াময়।

৩৪

দিবা রাতি থাক সবে বা-হুঁসারি *
রসুল বলে এ দুনিয়ার জ্ঞান ঝকমারি।
জাহের, বাতেন, শাফিনায়,
গুপ্ত ভেদ সব দিলাম সিনায়,
এমনি মত তোমরা সবায়
দিও সবারি।
অবোধ ও অভক্ত জনা,
গুপ্ত ভেদ তারে বলো না,
বলিলে সে মানিবে না,
করবে অহঙ্কারই।

* হুঁসিয়ারীর সঙ্গে, সাবধানে।
জাহের = প্রকাশ, বাতুন = অপ্রকাশ, শাফিনা = *Intercession.* সিনায় = বক্ষে,

পড়িলে আয়ুজবেল্লা,
হুঁসিয়ারীর সঙ্গে, সাবধানে,
দূরে যাবে লানতুল্লা,
লালন বলে রসুলের
নসিয়ত জারি।

৩৫

অপারের কাণ্ডার নবিজী আমার,
ভজন সাধন বৃথা গেল নবি না চিনে।
নবি আওয়াল ও আখেরে,
জাহের ও বাতন,
কোন সময় কোন রূপ
ধারণ করে কোন খানে।
আসমান জমিন জলধি পবন,
নবির নূরে করিলেন সৃজন,
তখন কোথায় ছিল নবিজীর আসন,
নবি পুরুষ কি প্রকৃতি আকার।
আল্লা নবি দুটি অবতার,
আছে গাছ বীজেতে যে প্রকার,
গাছ বড় না ফলটি বড়,
তাও নাও হে জেনে।
আত্ম তত্ত্বে ফাজেল যে জনা,
সেই জানে সাঁই-এর নিগূঢ় কারখানা,
হলেন রসুল রূপে প্রকাশ রব্বানা,
অধীন লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের গুণে।

আয়ুজবেল্লা = আল্লার শরণাপন্ন হইতেছি, লানতুল্লা = খোদার অভিশাপ, রসুল = *Prophet*, আউয়াল = প্রথম, আখের = শেষ।

৩৬

অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়,
ভজন সাধন মুখের কর্ম্ম নয়।
ও দেখো তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।
ও দেখো চাতক মরে জল পিপাসায়,
চাতক থাকে মেঘের জলাশায়,
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।
ঐ দেখ রামদাস মুচির ভক্তিতে,
গঙ্গা এলেন চামড়ার 'বাটু'তে,
দেখে সাজ্‌ল কত মহতে।
এবার লালন কুলে কূলে বয়
অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়।

৩৭

গুরু রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে
(ঝল্‌ক দিচ্ছে যার অন্তরে),
কিসের আবার ভজন সাধন লোক জানিত করে,
(এই ভবে লোক জানিত করে)।
বকের করণ ধরণ তাই রে হয়,
দিক ছাড়া তার নিরিখ ও সদায়,
ও সে পলক ভরে ভবপারে যায় সে নিরিখ ধরে।
(মানুষ যায় সে নিরিখ ধরে)।
গুরু ভক্তির তুল্য দিব কি ?
যে ভক্তিতে থাকে সাঁই রাজী,
অধীন লালন বলে গুরু রূপে নি-রূপ মানুষ ফেরে
(এই ভবে নি-রূপ মানুষ ফেরে)।

জ্যান্তে গুরু পেলেম না হেথা,
ম'লে পাবো কথায়ই কথা,
অধীন লালন বলে গুরু রূপে নি-রূপ মানুষ ফেরে।
(এই ভবে নি-রূপ মানুষ ফেরে)।

৩৮

কেরে গাঙের ক্ষ্যাপা হাবুর ডুবুর ডুব পাড়িলে,
পাপ করে কি ভাবছো মনে কার্তিক ওলানের কালে।
কুঁত্‌বি যখন কফের জ্বালায়,
কত তাবিজ তাগা বাঁধবি গলায়
তাতে কি তোর ভাল হবে মস্তকের জল শুস্ক হলে।
বাই চলা দেয় ঘড়ি ঘড়ি,
ডুব পাড়গে তাড়াতাড়ি
অধীন লালন বলে ডুবল বেলা চক্ষু মেলে দেখলি না রে।

৩৯

সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে।
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময় কোন রূপ ধরে।
গোঁসাই গঙ্গা গেলে গঙ্গাজল হয়,
গোঁসাই গর্ত্তে গেলে কূপ জল হয়,
গোঁসাই অমনি করে ভিন্ন জনায়
সাধুর বেশ বিচারে।
গোঁসাই আপনার ঘরে আপনি ঘরী
গোঁসাই সদা করে রস চুরি
জীবের ঘরে ঘরে।
গোঁসাই আপনি করে ম্যাজেষ্টারী,
আপন পায় পড়ল বেড়ী,
ফকির লালন বলে, বুঝতে পারলে
মরণ নাহি তার একই কালে।

৪০

কিসের বড়াই কর রে কিসের গৌরব কর রে
মাটির দেহ লয়ে।

সেখানেতে দেখে এলেম কুমারেরই কুমরে,
উপরে তার স্বরূপ আছে রে,
ও তার ভিতরে আগুন রে,
ও কেবল পথের পরিচয় রে
মাটির দেহ লয়ে।

মনের মনুরায় পাখী গহীনেতে চড়ে রে,
নদীর জল শুকায়ে গেলে রে,
পাখী শূন্য ভরে উড়ান ছাড়ে রে
মাটির দেহ লয়ে।

লালন শাহ দরবেশ কয় দুনিয়ার বড়াই মিছা রে,
দিন থাকিতে দিনের কর্ম্মরে,
কেবল পরার জন্য কান্দেরে
মাটির দেহ লয়ে।

৪১

বাঁকীর কাগজ মন তোর গেল হুজুরে,
কখন জানি আসবে শমন সন্তোষপুরে।
যখন ভিটায় হও বসতি,
ও মন দিয়েছিলে খোস কবুলতি,
ও আমি হরদমে নাম রাখবো স্মৃতি
এখন ভুলেছ তারে।
আইন মাফিক নিরিখ দেনা,
ও মন তাতে কেন করিস অলসপনা,
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে।
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা,

ও মন দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা,
লালন কয় সাধনের খেলা
মন তোর কিসে 'জৎ' ধরে।

৪২

চেয়ে দেখ নয়নে,
খড়ের কোথায় মক্কা মদিনে।
ওয়াহদিনিয়াতে রাহা,
ভুল যদি মন কর তাহা,
এবার হুজুরে জাতির পথ মিলবে না,
ঘুরিস কেন বনে বনে।
সদর আমলার হুকুম ভারী,
অচিন দেশে তার কাচারী,
সদাই করে হুকুম জারী,
মক্কায় বসে নির্জ্জনে।
চারি রাহা চারি মকবুল,
ওয়াহাদিনিয়তে রাসুল,
সিরাজ কয় কর না উল,
ও তুই ফিরবি লালন বনে বনে

৪৩

সামান্যে কি সে ধন পাবে,
দীনের অধীন হয়ে তার চরণ সাধিতে হবে।
ভজন পথে এহি হ'লো,
কত বাদশার বাদশাই গেল,

খড়=দেহ।

কত কুলবতী কুল খোয়াল,
শুধু চরণের আশে।
কত কত যোগী ঋষি,
তারা যোগে করে যোগ তপস্যি,
অধীন লালন ভেঁড়ে কুল নাশি
ভেঁড়ে দু-আশায় ফেরে।

৪৪

পারে যাবে কি ধরে ওরে মন,
যেতে হুজুরে তরঙ্গ ভবে ভেবে দেখ মন।
ইসরাফিলের শিঙ্গা রবে,
জমিন আসমান উড়ে যাবে,
হবে নৈরাকারময়
কে ভাসবে কোথায়।
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার,
ভাসছেরে সেই তুফানের উপর,
তাতে নজর হবে না
কোথায় দিবে পা সেই পথে।
পাপী অধম যার হেল্লা,
তরে যাবে পারের বেলা,
লালন বলে মন কি করিস এখন
ভবে চিনলেম না তারে।

৪৫

সাধ্য কিরে আমার সেইরূপ চিনিতে,
অহর্নিশ মায়া ঠুসি জ্ঞান চক্ষুতে।

আমি আর অচিন একজন,
থাকি আমরা এই দুই জন,
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন,
না পাই ধরিতে।
ঈশান কোণে হাসেসখড়ি,
সে নড়ে কি আমি নড়ি,
আপনারে আপনি হাতড়ে ফিরি,
না পাই ধরিতে।
ঢুঁড়ে ফিরে হদ্দ হইচি,
এখন বসে খেদাই মাছি,
লালন বলে সবে বাঁচি,
কোন কাজেতে।

৪৬

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়,
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তারে পায়।
রস রতি অনুসারে,
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয়।
লীলায় নিরঞ্জন আমার,
আধ লীলে কল্লেন প্রচার,
জানলে আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায়।
আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূল কথা,
লালন কয় হবে সেথা,
সাঁই পরিচয়।

৪৭

কতজন ঘুরছে আশাতে,
সন্ধান পেলাম না তার জগতে।
কুড়ি চক্ষু, চৌদ্দ হস্ত,
তাই দেখে হ'য়েছি ব্যস্ত,
শুনবার কারণ জিজ্ঞাসি তোরে।

মারফত যে জন হবে,
আমার কথার অর্থ ব'লে দিবে.
শু'নে দশের প্রাণ জুড়াবে,
দশ জনের সভাতে,
কতজন ঘুরছে আশাতে।

মক্কেল আল্লাহ খামেদ বারি,
কুদরতে ক'রলেন তৈয়ারী,
পয়দা করেছিলেন হাওয়াতে।

আমি শুনেছি মুরশিদের বাণী,
খায়নি তারা দানা পানি,
কিঞ্চিৎ দানা তার নিশানা,
সবুজ রং তার গায়েতে,
কতজন ঘুরছে আশাতে।

এক ফেরেস্তার তিন মাথা,
বল তার মোকাম কোথা,
থাকে কোন সহরে।
দেহের মধ্যে মাপা জোকা,
ফকির লালন কয়ে যায়,
কত জন ঘুরছে আশাতে।

৪৮

ওকি সামান্যে তার মর্ম্ম পাওয়া যায় ?
ও তার হৃদ-কমলে উদয় হলে অজান খবর জানা যায়।
দুধে যেমন ননী থাকে,
ধরে খায় রাজহংস হ'য়ে,
কারো মন যদি চায় সাধু হতে,
ঐ সে রাজহংস হয়
ওকি সামান্যে তার মর্ম্ম পাওয়া যায় ?
পাথরেতে অগ্নি থাকে,
বাইর কর্‌্যা ন্যাও ঠুকনী ঠুকে,
বোকা লালন চাঁদ তাই কয়
সামান্যে কি তার মর্ম্ম পাওয়া যায়।

৪৯

আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে,
আমার মন প্রাণ হরে নিল প্রেমের বরিষণে।
একে মোর জীর্ণ তরী,
বোঝাই তাই হয়েছে ভারী,
সাধনের করণ ভারী
বোঝগে সাধুর কাছে।
খেজমত কয় গেল বেলা,
ছাড় ভাই রসের খেলা,
খেজমত সাঁই-এর যুগল-চরণ
নিমতৈলিরো ঘাটে।
আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে।

৫০

বাদী মন ! কারে বলরে আপন,
যারে বল আপন,
আপন নয় সে নিশির স্বপন
পর কি কখনো হয়রে আপন ?
(ওরে পাগল মন !) কারে বলরে আপন।

এক দেড়াকে* পঞ্চ পাখী,
তারা আছে পরম সুখী,
বেলা গেলে চলে যাবে
যার যেখানে মন।
কারে বলরে আপন (ওরে পাগলা মন !)
সকাল বেলা হাটে চলো,
যার যে স'দা সে সে করো,
বেলা গেল সন্ধ্যা হল,
অঁাখি হল ঘোর। +
কারে বলরে আপন। (ওরে বাদী মন।)
আট কুঠুরী নয় দরজা,
তার ভিতরে মণি কোঠা,
কাজল কোঠায় সিঁদ কাটিয়ে
চোরে নিবে ধন।
কারে বলরে আপন,
খেজমত বলে ও পাগলা মন,
মিছে ভাবো সব অকারণ,
যেদিন ছেড়ে যাবে পবন
সেদিন কেহ নহে আপন।

* দেড়াক—পার্শী 'দরখ্‌ত' শব্দের অপভ্রংশ। দরখ্‌ত অর্থে বৃক্ষ।
I. C.p. 'Dim suffusion veiled'—Milton.

৫১

ও মন ধূলার ঘর বাতাসে যাবে,
দেহের গুমান আর করো না।
দেহের গুমান করলে পরে,
পড়বি রে তুই বিষম ফ্যারে,
দেহের গুমান আর করো না।
আনিছিলি বোসে খা'লি,
মহাজনের মাল ফুরালি,
হিসাব কালে লবে বুঝে,
কোন শেষে জান যাবে ছাড়ে
দেহের গুমান আর করো না।
ভাই বন্ধু ইষ্টি জনা,
কেউ কারো সঙ্গে যাবে না,
পথের সম্বল তাও নিলে না,
রাস্তায় যা'তে কষ্ট হবে
দেহের গুমান আর করো না।
খেজমত সাঁই ফকিরে বলে,
দিন গেল ভাই গোলমালে,
আসবে শমন বাঁধবে কোষে,
খালি হাতে যা'তে হবে
দেহের গুমান আর করো না।

৫২

জপ্ রে তার নামের মালা হয় না যেন ভুল
গাঁথ ঐ নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা,

অন্ধকার হবে উজালা,
এই দুনিয়ার মূল।
তুমি লা এলাহা ইল্লাল্লা* বল,
এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
অই ভবের হাট ভু'লানোরে মহম্মদ রছুল।
নুহ্ অল্ এছ্ বাৎ+নফুয়াল্ নবি÷
ও তোমার ফানাফাল্লা×যখন হবি,
মেছের শা কয় তবে হবি
আল্লার মকবুল। ( )

* আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই। সাধনকালে হিন্দুগুরু যেমন শিষ্যকে বিশ্বের সর্বত্র 'ওঁ' ধ্যান করিতে উপদেশ দেন, পীর সাহেবরাও তেমনই ভিতরে বাহিরে এই কলমা জপ ও ধ্যান করিতে বলেন। প্রথমেই অবশ্য এই কলমা জপ করা হয় না। প্রথম শুধু আল্লাহ—এই কথাটি মনে মুখে জপ করিতে হয়। যে নিয়মে এই সব ধ্যান ধারণা করিতে হয়, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ নিষিদ্ধ।

+ নুহ্ অল্ এছ্ বাৎ—'নফি এছ্ বাৎ' কথার অপভ্রংশ। ইহার ভাবার্থ 'লা এলাহা ইল্লাল্লা' দ্বারা নিজের নাস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কল্পনায় সর্বত্র সেই অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্মের অসীম সৌন্দর্যময় অস্তিত্ব অনুভব করা।

÷ নফুয়াল্ নবি—'নফিয়ন্নবির অপভ্রংশ। আর এক নাম ফানাফির-রছুল' অর্থাৎ রছুলোল্লার (হজরত মোহাম্মদ দঃ এর) ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

× এসলাম ধর্মমতে আধ্যাত্মিক জগতের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভক্তকে সাধনার তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ ফানাফিশেখ্' বা আপন পীরের সহিত লয় প্রাপ্তি। সত্য সনাতন নিরাকার মহাপ্রভুর দর্শন লাভাকাঙ্ক্ষায় অবশ্য পীরের ধ্যান করিতে হয়। পীর ভক্তের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য লাভের সহায় মাত্র। প্রথম স্তর অতিবাহিত হইলে, ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই সিদ্ধিলাভের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট সহায় রছুলোল্লার ধ্যান করিতে হয়।

৫৩

রসিক যে জন ভঙ্গীতে যায় চেনা,
সদাই থাকে রূপের ঘরে,
রূপ নয়নে সদাই হেরে,
ভঙ্গীতে ধরা পড়ে,
আর ত সুখ জানে না।
শুদ্ধমতি শান্ত গতি বর্ণে কাঁচা সোনা,
লোকে কয় চণ্ডীদাস-রজকিনী,
তারা প্রেমের শিরোমণি,
এমন প্রেম জানে কয় জনা।
ঈশান কয় দুগ্ধ জলে
একত্রে মিশাইলে (পরে)
হংস তাহার লাগাল পাইলে

ইহার নাম 'ফানাফিররছুল'। সাধনার সর্বশেষক্রম ফানাফিল্লা অর্থাৎ আল্লাতে মিশিয়া যাওয়া। বহির্জগতে আত্মিকজগতে যাহা কিছু—সবই আল্লার, সবই তাঁহার নাম-গানে বিভোর। এই স্তরে উপস্থিত হইলে, সাধক আত্মজ্ঞানহীন হইয়া মহর্ষি মনস্থরের মত 'আনাল্ হক' বা 'অহংব্রহ্ম বলিতে থাকেন। অনন্ত জ্ঞানময়ের সহিত মিশিয়া গেলে লোকের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কি করেন, কি বলেন সে জ্ঞান তখন তাঁহার থাকে না। কেহ পাগল বলে, কেহ ভণ্ড বলে, কোন দিকেই দৃকপাত করেন না। শহেজাদী জেব্‌উন্নিছা বলেন ঃ

ছারে জং আস্‌ত বা মাজ্‌নুনে আজাঁ আহ্‌লে শরিয়াৎয়া।
কে দর্ দর্‌ছে মহব্বৎ নোক্‌তায়ে বাহার ছোখন্ গিরাদ্।।

আল্লার-প্রেমপথের পথিকেরা প্রেমাতিশয্যে জ্ঞানহীন। সাধারণ লোকেরা কিছু না বুঝিয়া তাঁহাদের সহিত অযথা তর্ক করিতে যায় অন্যায়রূপে গালি দেয় () মকবুল—বন্ধু, প্রিয় ব্যক্তি।

মৌলবী রজব আলী, বি, এল,

করে অরূপ সাধনা
ভাণ্ডের মাঝে চুমুক দিয়ে,
যায় সে দুগ্ধ খেয়ে,
ভাণ্ডের জল ভাণ্ডে থাকে
রসিকের তেমনি ঘটনা।

৫৪

মানুষ চিনে সঙ্গ নিও মন, গোল যেন আর করোনা করোনা,
মন তুমি জল পিপাসায় আকুল হয়ে গরুর চোনা খেওনা।
কালসাপিনীর হাতে পড়ে, মরবিরে তুই একই কালে,
'দংশিলে' হবি বেবোনা (ও তুই হবি বেমোনা),
ও তুই দেশ বিদেশে ঘুরে মরবি বিষের ঔষধ পাবানা।
গোঁসাই নলিন চাঁদ বলে, খন দুগ্ধ 'পুরো' হইলে
জালে কম হইলে হইবে না
(জালে কম হইলে হইবে না।)
মন তুমি সামাল থেকো ঘুমের ঘোরে
চোরে দেয় না যেন হানা।

৫৫

ও মন পারে যাবে কি ধরে !
চুলের সাঁকো তাতে হীরার ধার, হচ্ছে সে তুফানের পরে।
নজর আসবে না কোথায় দিবে পাও সেই পথেরে।
ইস্রাফিলের সিঙ্গা রবে,
জমিন আসমান উড়ে যাবে,
নৈরাকারে ভাসবে রে ভাই কে কোথায়,
পাপী অধমেরা কি নিয়ে যাবে পারে পারের বেলায়।

৫৬

অনুরাগী রসিক যারা বাচ্ছে তারা উজান 'বাঁকে',
যখন নদীর 'হুমা' ডাকে, জাগায় তরীর ফাঁকে ফাঁকে।
যখন নদী নিরলেতে বয়,
ওরে দাঁড়ী মাল্লা ছয়জনাতে ডেকে ডেকে কয়,
ওরে ছেড়োনারে সাধের তরণী, "দোয়ানীতে"
'পাক' পড়েছে।
মন পবন বাতাস উঠবেরে যেদিন
ছয় মাসের পথ বয়ে আমরা যাবরে একদিন।
জয় রাধার নামে বাদাম দিয়ে হাল-মাচার পর থাকিব বসে।
পঞ্চরসের ধ্যান যে করে,
'আড়ে' নদী দ্যায় না পাড়ি, দিক্‌পাড়ি' ধরে।
জয়রাধা নামের বাঁধাতরী, তার তরী কি পাকে পড়ে।
গোঁসাই নিত্যানন্দ কয় মধুর স্বরে,
গুরু মুখ পদ্ম বাক্য ঐক্য না হলে,
(পড়বিরে তুই বিষম ফেরে।
গোঁসাই হীরালাল কয় কয় গঙ্গাধররে তোর
তরীর কি গোমর আছে?

৫৭

ওরে ঘর দেখে মরি এঘর বেঁধেছে কোন ধনী,
দুই খুঁটি পরিপাটী মধ্যে আগুন পানি,
ঘরের নয় দরজা, দেখতে মজা, বাতাস বয় রাত দিনই,
ওরে বাতাস বন্ধ হলে সে ঘর থাকবে না ত' জানি।
সে ঘর আগুনে পোড়ে না, পানিতে পচে না,
বলবো কি আজব লীলা বিধির কি কারখানা,
আমি 'খুচি' দিয়ে রাখবো সার‍্যা ঘরামী মেলে না।
ঘরের মধ্যে ব্যক্তি বহুজন,
কেউ কাণা কেউ কানে শোনে না, এও ত বিলক্ষণ।

আমি মেছেল চাঁদ ঘরে বসে করছি আনাগোনা,
সাধের ঘর ফেলে যাবো এও ত এক ভাবনা,
ওরে যে না জানে ঘরের সন্ধান সেও ত এক আধলা কাণা,
তোরা দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে করগে জানা শোনা।

৫৮

মনের মানুষ অটলের ঘরে,
খুঁজে নেও তাঁরে,
নিগু'ণেতে আছে মানুষ,
যোগেতে বারাম খেলে।
শুদ্ধ, শান্ত, রসিক হ'লে
তবে অধর মানুষ মেলে,
রূপ নেহারে গোল করিলে
এসে মানুষ যায় ফিরে,
কত জন পার হবে ব'লে
বসে আছে নদীর কূলে,
হঠাৎ ক'রে নামতে গেলে
ধ'রে খায় কাম-কুম্ভীরে।
গোঁসাই নয়ন চাঁদের উক্তি
ভাবরে মন সেই প্রকৃতি,
তবে হবে ব্রজ প্রাপ্তি
ওরে চণ্ডী কই তোরে।

৫৯

(গুরু)

ওরে হাজারী কয়, মায়ার ভুলে,
ও তোর সাধন হৈল না,

ও তোর সাধন হৈল না,
ও তোর ভজন হৈল না।
আরে হীরের দরে কিনলেন রে জিরে,
থাক্ মোনাফা আসল মিলে না।
অসময় ঘাটে গেলে নিতাই
পার তো করবে না।
নিতাই পার তো সারিবে না,
হায়রে নিতাই নৌকায় তুলবে না,
দিন যাবে মন, কাঁদবি রে বসে,
হায়রে তোমার কাঁদন কেউ তো শুনবে না।

৬০

প্রেমের ভাব কি সবাই জানে,
প্রেমের প্রেমিক সাধক য়ারা,
জীউতা মানুষ হয় গো মরা,
তাহার নাগাল পা'লে আমরা,
ভক্তি দিই তার প্রেম চরণে।
প্রেমের ঘরে প্রেমের আসন,
জানে শুনে কর সাধন,
অৰ্দ্ধচন্দ্র দিব্য দরশন,
দেখা পাবি যোগ সাধনে।
প্রেমের দেশে প্রেমের মানুষ,
জানে তারা আগম নিগম,
প্রেমুন (?) তারা রূপ সনাতন,
ফকির হ'ত ভাই দুই জনে।
আজিম অতি মূঢ়মতি,

বাসনা তার প্রেমের ভক্তি,
নাইক রসের সাধন শক্তি
নীরসে রস হবে কেনে ?

৬১

প্রেমের মানুষ বিনে কে জানে,
ও সে প্রেমে মত্ত হ'য়ে আছে গোপনে।
সে প্রেমের এমনি ধারা,
জানে প্রেমের রসিক যারা,
সে প্রেমে মজ্‌রে তোরা গোপনে।
প্রেমের বাক্‌সোর মদ্দি মানুষ আছে একজনা,
চাবি ছোড়ানী নিয়ে গেলে কালের ভয় রবে না।
কাসিম কয় এমনি হারা,
কঠিন সেই মানুষ তোলা,
সখা করি বারিতালা
সেই জানে মানুষ কোন খানে।

৬২

আছে পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে ঢাকা,
চাঁদের নীচে বিন্দু সখা
মেঘের আড়ে চাঁদ রয়েছে
মেঘ কেটে চাঁদ উদয় করা
সেটা কেবল কথার কথা।
মদন বলে অন্ধিকারে,
বন্দ হ'য়ে রলি একা,
যাহার আছে মুরশিদ সখা
সেই সে পাবে চাঁদের দেখা।

৬৩

ধরবিরে অধর জানবিরে অধর,
ধরবি সে আলেক মানুষ আগে তার পাটনী ঠিক কর।
আসমানে পাতালে পাত ফাঁদ,
যোগিনী ধরতে হবে গগনের চাঁদ,
মনে প্রাণে ঐক্য হলে তারে পাওয়া যায়
মদন শা ফকিরে বলে সময় বয়ে যায়।

৬৪

একবার সাধুর সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ডুব্যা দেখরে মন।
গোড়া ধর্‌য়া সাধন করলে, অমূল্য ধন আপন মেলে হায়রে।
ডাল ধরে গুণতে গেল, হয় না নিরূপণ।
বিশ্বাস করলে যে ধন পাবি,
সাধন করলে তাই কি হ'বে হায়রে।
সুখ সাগরে ডুইব্যা রইবি প্রফুল্ল জীবন।
সাধুর সঙ্গে নিলি মেলা,
দূরে যাবে সকল জ্বালা, হায়রে!
গোপাল বলে প্রেমের গোলা
ও সে যে খোলা সর্ব্বক্ষণ।

৬৫

চাপান ধুয়া

অধম ছোরমান আলি কয়, আন্‌কা ধুয়ো বেঁধে গাওয়া
আমার সাধ্য নয়।
চার চিজে হয় দেহ পয়দা, কোন চিজ তখন কোথায় রয়?
আগেতে হয় চক্ষু পয়দা, পিছেতে নাক পয়দা হয়,
আতশে মগজ পয়দা খাকীতে দেহ পয়দা হয়।

যেদিন শমন আসবি ভার, সঙ্গের সাথী
কেউ হবে না পুত্র পরিবার,
কাল শমনে ধরিয়া নিবে একেলা গোরের মাঝার,
অধম ছোরমান আলি বাঁধছে ধূয়ো,
পয়ার মেলা বিষম ভার,
দিনের দিন গত হইল, সকলে হওরে হুঁসিয়ার।
ও-দলের 'ধরতা' কয়জনা, লালখলিল,
কিছু, কদম ওরাই তিনজনা,
সে কথা বলে পাজীর মতন, এক কথাও তার
ঠিক মেলে না,
অনুমানে বুঝতে পারলাম নিতান্ত শয় ...

৬৬

রসের ধুয়া

আল্লা যারে ব্যাটা কোলে ভ্যায়
খুসী হয় তার বাপ মায়,
খুসী হয়্যা আল্লার আগে কয়,
আমি নালিশ করি ওগো আল্লা
বেটা যেন আমার বাঁচিয়ে রয়।
ইষ্টিকুটুম দরদবন্ধু আল্লা রাখো 'বরজায়'।
তিনে সুখে ব্যাটার বিয়্যা ভ্যায়,
পরের ম্যায়া আন্যা ভ্যায়,
সেই ঘরেতে রসের ময়না রয়।

চেক্না সুরে কয়না কথা, চোক্ ঢুলিয়ে আর
কাঁদিয়ে কয়,

'এত জ্বালা কার শরীরে সয়।
বুড়্যা বুড়ীর 'ক্যান ক্যানি'র জ্বালায়,
শরীর কালা হয়ে যায়।
কই যে পতির চরণ ধরি,
তুমি আমার গলায় দাও ছুরি,
নইলে দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়া মরি।'
এই কথাটি শুনে বড়, উঠলো বড় রাগ করে,
বুড়া বুড়ীর কিসের ঘর বাড়ী,
তুমি ন্যাও বুঝ্যা হাঁড়ি।
চাইলে দিস্ না খর 'আলোপাতা,'
তোর বাপ মার কি কথা,
চাইলে পাই না খর 'আলোপাতা।
মুক্ নাড়ে 'পাঙাশের' মত, পান চাবায়
আর ক্যান ক্যানায়,
এত জ্বালা কার শরীরে সয়।

৬৭

ধুয়া গান

আনকা ধুয়া বেঁধে গাওয়া
আরে ও আমার শক্তি নাই।
চুল পাকে দাঁত পড়ে গেছে,
কোন দিন মরে যাই।
হায়রে হায় বসে ভাবছি তাই।
চোতের শেষে বৈশাখ মাসে
ম'ল সোদ্দের ভাই,
ওরে ও ভাই বলিতে,

আরে ও আমার লক্ষ্য নাই।
ভাইএর কথা হৃদয় গাঁথা
আরে ও সদাই হয় মনে,
দিবানিশি বসে কাঁদি
বিচ্ছেদ আগুনে।
ইচ্ছা হয় মনে
যাই ভাই অন্বেষণে।
যার মরেছে সোদ্দর ভাইরে
সে কেবল জানে,
অন্য লোকে জানবে কেমনে।
পাছে আ'লি আগে গেলি
আরে ও আমারে ফেলে,
শিশু ছেলে রোদন করে
বাপজী বাপজী বলে।
তোরে না দেখলে
প্রাণ যার জ্বলে।
তুমি বিনে এত দুঃখ আমার কপালে,
কোলে আয়রে মিঞাভাই ব'লে।

৬৮

পাগলা কানাই বলে ভাইরে ভাই,
কত রঙ্গ দেখলাম এই ভবে এসে দু'চোখে।
যত করিলাম দেব ধর্ম্ম সকলি ফাঁকি জুকি,
একটু ভাল কইতে হল, সার কেবল আল্লারে ডাকি।
একজনা নারী অন্য পুরুষ,
দু'জনারে এক কবরে মাটি দিয়া থুইছিল,

আমি শুনতে পাই মুরশিদের মুখে,
জেন্দা তার ছেলে হল,
ছেলে হলে শুন বলি তিন জন এই ভবেতে এল।
শুনে প্রাণ কান্দে ডরে আমি কান্দি থরে থরে,
জানিলাম আল্লার লীলা খেলা যা করে তাই পারে।
(তোমার) রাখ ইমান জুটল না রে পুছ কর আলেমের ঠাঁই,
সত্য কি মিথ্যা বলে,
তোমরা যেবা জান যেবা মান,
সকলি আল্লাতালার ক্ষমতা,
আল্লা শোকর মেরা দরগায় তেরা
দলীল কভু না হবে বৃথা।

৬৯

বুড়া বসে পাগলা কানাই এই ধুয়া বেঁধেছে ভাই,
ধুয়োর নাম স্বর্গ পাতালে,
(ওরে) ভাই সকলেরে ধুয়োর বিচার করে কে ?
ভবের পর এক সক্‌স পয়দা
আল্লার পয়দিস নয়কো সে,
আছমান আর জমিন না ছিল পবন পানি,
ত্রিভূবন জুড়ে রয়েছে,
পাগলা কানাইএর বাড়ী তার কাছে,
মহম্মদের নয়কো উম্মত আদমের নয়কো বুনিয়াদ।
ভবের পরে জুয়ো-মুট খেলায়,
ওরে ভাই সকলরে পাগলা কানাই কয়ে যায়,
কত ফকির বোষ্টম আলেম ফাজেল,
পড়ে গেছে তার ঠেলায়,

গেল চারিটা কাল হয়ে হাল ছে বেহাল,
কারো পরকাল হল না পাগলা কানাই মিথ্যা কয় না
শুন ভাই আমার ত বুদ্ধি জ্ঞান কিছু নাই,
দেশ দুনিয়া যেদিন পয়দা,
সেই সক্‌স সেই দিন পয়দা,
বেদ পুরাণ খুঁজলে পাবা না।
ওরে ভাই সকলরে তার সন্ধান করলে না,
অ-সন্ধানে থাকলে পরে সে ত কারে ছাড়বে না।
যাবে বুদ্ধি সে হবে রসাতল
এক সক্‌স বসে আছে গাছের তলায়।

৮৭

জাগ গান

পাবনা জিলার নানা পল্লীতে জাগ্‌গান প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষ মাসেব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাত্রিকালে বাড়ী বাড়ী পল্লীর নিরক্ষর অজ্ঞাত পল্লী কবি রচিত গান গায় এবং ভিক্ষা লয়। এইভাবে সমস্ত পৌষ মাস গান গাহিয়া যে সমুদয় পয়সা, চাউল, ডাউল প্রভৃতি পায় তাহাই দিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে নিজেরা পাক করিয়া খায়। এই ধরণের গান অন্য কোন জিলায় প্রচলিত আছে কিনা, এবং থাকিলে উহা কি ধরণের ও কি বিষয় লইয়া রচিত, তাহা আলোচনা হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এই প্রথাটি দিন দিন লোপ পাইতেছে। আমার মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই এই দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথা চিরতরে লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যাইবে। এই প্রথা কোন সময় হইতে আমাদের বাঙলা দেশে প্রচলিত তাহাও আলোচনা করিবার যোগ্য। এই সব গানের রচনাকাল বাঙলায় মুসলমানগণের প্রতিপত্তির সময়কার বা তাহা পরবর্ত্তী সময়কার এবং ইংরেজ আমলের পূর্ব্বেকার, তাহার

কারণ ইহার ভাষা আরবী, ফারবী ও উর্দ্দু শব্দবহুল। ইংরাজী পল্লী গাথার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

(জগ্‌গান সম্পর্কে আরও দেখুন : প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫, পৃঃ ৮৬৫)।

ধুয়া

"এ মা দয়া নাইরে তোর,
মা হয়ে কেন বেটায় সদা বলো ননী চোর।"
কেষ্ট যায়, মা, বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,
খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
"ননী খা'লো কেরে গোপাল ননী খ'লো কে?"
"আমি ত মা খাই নাই ননী বলাই খা'য়াছে।"
"বলাই যদি খাইতো ননী থুতো 'আদা' 'আদা'
তুমি গোপাল খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা।"
ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,*
এক লম্ফে উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল ডালে না দেয় পাও,
গাছের নীচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।
"নামো নামে ওরে গোপাল পাড়্যা দেই তোর ফুল,
কদম্বের ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"
"নামি নামি ওরে মারে একটি সত্য করো,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তা কি আর হয়রে গোপাল তা কি আর হয়,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা সর্ব্ব লোকে কয়।"
নালা ভোলা দিয়া গোপালে গাছ হতে নামা'ল,
গাভী 'ছাঁদা' রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।

---

* বঙ্গবাণী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১), ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন মহোদয় লিখিত "মারাঠা ও বাঙ্গালী" প্রবন্ধে যে পল্লীগাথা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনীয়।

ধুয়া

এ মা দয়া নাই রে তোর,
এত সাধের নীলমণি বান্ধা রইল তোর।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি মা রে বন্ধন গেল কষে,
বন্ধনের তাপে মা রে লোহু চললো ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি মা রে বান্ধনের জ্বালায় মরি,
কাঁচা ডোরের বন্ধন মা রে সহিতে না পারি।
কিবা বন্ধন বাঁধলি মারে বন্ধন পিটে মোড়া,
বন্ধনের তাপে মা রে ছুটলো হাড়ের জোড়া।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
নন্দঘোষের ধেনু রেখে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
হাতের বালা বন্ধক থুয়ে দেব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
বাড়ী ছেড়ে যাবো আমি মামাদের বাড়ী,
মামাদের গরু রেখে দিব ননীর কড়ি।
ঐ কথাটি শুনে মা'র একটু দয়া হ'ল,
হাতের বন্ধন ছেড়ে দিয়ে গোপালে কোলে নিল।

৭১

ফরিদপুর জেলার মেয়েলী গান

বাঙালীর সহজ সরল ও সরস জীবনগতির এক অধ্যায় আমরা এই সব মেয়েলী গানের মাঝে পাই। গানগুলি এত সুন্দর, এত কবিত্বময় এবং এত অনাড়ম্বর যে ইহা আমাদিগকে অতি অল্পেই মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

এই গানগুলি কোন সময়কার রচনা তাহা ঠিক করা মুস্কিল। তবে এটা সত্য যে, ইহা মুসলমান প্রভাবের বা তাহার পরের সময়কার। গানগুলির ভাষা অতি সহজ ও সরল, লীলাভঙ্গী অতি মনোহর ও চমৎকার, ব্যঞ্জন

বেশ সুন্দর। পদাবলীরচয়িতা কবি শশিশেখরের ভাষার সাথে এবং রচনা প্রণালীর সাথে বেশ খাপ খায়, মনে যেন একই ছাচে ঢালা ও একই যুগের তৈরী।

এই সব গানে কতকগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এগুলি মুসলমান কি হিন্দু কবির রচনা তা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়। গানের সাধারণ পোষাক দেখিয়া মনে হয় হিন্দু কবির রচনা ; কিন্তু সে ভ্রান্তি ভাষা দেখিয়া অপনোদিত হয়। যাহোক বিশেষজ্ঞগণের হাতে ইহার ঠিকুজী আর গোত্র নিরূপণ করিবার ভার দিরা খালাস পাওয়া যাউক।

(আরও দেখুন : ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৫, পৃঃ ৭০৩-৭০৫)

(১) "কোলের ব্যাসাদ"--"গঙ্গা মা" পার করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করা হইতেছে ; আর মানত করা হইতেছে "ঝাঁপির ব্যাসাদ" অর্থ—অলঙ্কার ও "কোলের ব্যাসাদ" অর্থ—সন্তান। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

(২) "ঝাঁপির ব্যাসাদ"—অর্থ গহনা পত্র, টাকাকড়ি।

(৩) "মহীফল রাজা ফেটেছে দীঘি, আমি সেই দীঘিতে যাবো"। মহীফল শব্দ মহীপাল শব্দের উচ্চারণ বিভ্রাট। মইপল বা মহীফল উভয় শব্দই গানে শ্রুত হওয়া যায়।

C-p. "The founder of this family (Pa) has left a great monument of his reign to the vast pond of Muhee pall diggy in the Dinajpore district."

Vide. History of Bengal by J. C. Marshman. Srerampure. 1836. page 2.

(ক)

এটু এটু মসনের ফুল, জামাই বল কতদুর ?
জামাই এল ঘামিয়ে, ছাতি ধর নামিয়ে।

ছাতির উপর ওকেলা, বিবি নাচে বিমলা,
সাধুরে ননদের বড় জ্বালা,
এক ননদের জ্বালায় জালায় শরীর হ'ল কালা।
কানছি কোণা ঘরের কোণা ছিট্‌কীর ডাল*
তাই দিয়ে উঠাব নিধের (পিঠের) ছাল,
সাধুরে নন্দর বড় জ্বালা।

* কান্‌চি কোণায় সাধারণতঃ ছিটকীর গাছ জন্মে। ছিটকীর ডালগুলি খব সরু। ইহা দিয়া মারিলে শরীরে দাগ বসিয়া যায়।

(খ)

ঢাকাই পানেতে আ'লো রে দামাদ,
দামাদ মশুরী টানায়ে, মশাল জ্বালায়া,
কি কি জেওর আনিছ রে দামাদ বিবির লাগিয়ে,
[দামাদ] "এনেছি এনেছি রে মামা + সাহেব,
কাগজে জড়িয়ে, নিক্তিতে তলিয়ে।"
বিবি বড় গুমেনীর গুমেলা ×
ফেলিল ছিটিয়ে, ফেলিল উদেয় ÷।
দামাদ বড় রসিকের রসিকে,
(হারে) তুলিল খুটিয়ে, (হারে) পরাল বসায়ে।

(গ)

'গাছের কুলে কি হালে পুরুষে কিসেরই বাদ্য বাজে,
তোমারি সোয়ামী কি হালে নীলা দোসর বিয়ে করে,"

\+ মামা আম্মা শব্দের অপভ্রংশ। ইহা আরবী শব্দ—অর্থ মাতা।
× অভিমানিনীর অভিমানিনী। গুমেন শব্দ পারশী গোমান শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ—অহঙ্কার, বড়াই (চরিতার্থে) অভিমান।
÷ ঊর্দ্ধ করিয়া, দূরে।

"আমি নীলে থাকতে কিসের দুঃখ, কি হারে সাধু
দোসর বিয়ে কর।
আমার এক থালার ভাতরে সাধু তুই থালে হ'ল,
এক বাটার পানরে সাধু তুই বাটায় হ'ল,
এক ফুলের বিছানা রে সাধু তুইখানে হ'ল।"
"সোয়ামীরে বরিতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা
লাগে।"
"সোয়ামীরে বরিতে কি হালে সামিলে সোনার ফুল
লাগে।"
সোয়ামীরে বরিতে কি হালে সামিলে সোনার
ধান দুব্‌লা লাগে?"
"সতীনের বরিতে কি হালে পুরুষে কি কি ছামানা লাগে?"
"সতীনের বরিতে কি হালে সামিলে আঁইশঠে
কুলে চালুন লাগে।"
"কি হারে সাধু কিসেব দুঃখে রে দোসর বিয়ে কর।"
"স'য়া যদি খাবার পার, লো নীলে স'য়া বসে খাও,
না যদি খাবার পাও সাথে নায়ারে যাও।"
"একটু সরে শোওরে সাধু তোমার শিথানে একটু বসি,
একটু সরে শোওরে সাধু তোমার পথানে একটু বসি।"
"আমার শিথানে রয়েছে রে নীলে উয়্যার পায়ের জুতা,
আমার পথানে রয়েছে রে নীলে খেঁকি কুত্তার বাচ্ছা।"
ওই না কথা শু'ন নীলা ধূলায় লুটায়ে কাঁদে।
ধূলায় লুটায়ে কাঁদ্যারে নীলে, কোলের জয়ধর কোলে নিল,
ধূলায় লুটায়ে কাঁদ্যারে নীলে, ঝাঁপির ব্যাসাদ গলায় নিল,
আর কতদুর যায় রে নীলে মধ্যি সমুদ্দুর পা'ল,

মধ্যির সমুদ্দুর পেয়ে রে নীলে ধূলায়ে লুটায়ে
কাঁদিতে লাগিল।

"পার কর পার কর রে গঙ্গা মা ঝাঁপির ব্যাসাদ দেব,
পরে কর পার কর রে গঙ্গা মা কোলের ব্যাসাদ দেব।"
ওই না কথা শুনে রে গঙ্গা মা পার করিয়ে দিল,
এপার হতে ওপার যেয়ে রে নীলে ধূলায় লুটায়ে
কাঁদিতে লাগিল।

"পার করলে পার করলে গঙ্গা মা জোড়া পাঁঠা দেব,
পার করলে পার করলে গঙ্গা মা জোড়া মোষ দেব।"
খবরের আগে খবর গেল নীলের বাপজানের আগে,
খবরের আগে খবর গেল নীলের চাচাজানের কাছে।

আগে পাছে মা বাপ মধ্যি চল্‌লো নীলে,
"কিসের দুঃখে নীলে তুমি হাঁটে নায়ারে এলে?"
"তোমাদের জামাই রে বাবাজান দোসর বিয়ে করে,
তোমাদের জামাই রে চাচাজান দোসর বিয়ে করে।"

(ঘ)

আবের গাছটি কাটিয়া,
চন্দন কাঠটি ঝুরিয়া,
আ'লো রে বাছার দামাদ নিহারে ভিজিয়া,
আ'লো রে বাছধন রোদে ঘামিয়া।
বিবি যদি তুমি আপন হও,
আবের পাখা নিয়ে হাজির হও,
আবের জুতা নিয়া হাজির হও।

আমি কি সাধু হারে তোমার জুতার যোগ্য,
আমি কি হারে তোমার আবের পাখার যোগ্য ?
আবের পাখা দামাদ বেচিয়া,
আবের জুতা দামাদ বেচিয়া,
আন রে তোমার আবের পাখার মানুষ।

(ঙ)

হলদি কোটা কোটা জামাই মোটা মোটা
সেও হলদি কোটবো না সেও বিয়ে দেব না
কাঁচা মেয়ে দুধের সর কেমনে করবি পরের ঘর
পরে ধরে মারবি, খাম ধরিয়া কাঁদবি।
কানছি কোনা ছিটকীর ডাল, ডাল দিয়া উঠাবি
পিঠের খাল।
মায়ে দিল তেল কাজল, বাপে দিল শাড়ী
ভায়ে দিল লাটির গুতা চললো ভাতার বাড়ী।
[লাঠির গুতা খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল, মায়ে প্রবোধ দিতেছেন]
ওমা ওমা কেঁদ না সানের গলা ভেঙ না
দুয়ারে যে ধান টিটি পক্ষী খায়,
সোনার যে জামিরন শ্বশুর বাড়ী যায়।

(চ)

ও মোর সাধু রে কাঁঠালের সেন ফ্যালায়ে গেল মুচি রে,
আঁধারে কামাও, জোছনায় নাওয়াও কি মোর সাধু রে।
প্রভাতে শুখাল বিবি মাথার কেশ,
আমও তো বলে লো, ও যে ত চালে লো কি মোর সাধু রে,
বিনি পাল্কীতে যায়ো না শ্বশুর বাড়ী।

(ছ)

ফুলের সাজি কাঁখে না করে রে বেগম ফেরে গলি গলি,
ফুলের সাজি কঁাখে না করে রে বেগম ফেরে রাস্তায় রাস্তায়।
"তোমার ফুলের দাম রে বেগম হবে কত টাকা ?"
"আমার ফুলের দাম রে রাজার বেটা হবে হাজার টাকা।"
"আমার সাথে চল রে বেগম দিব সীথির সিঁদুর,
আমার সাথে গেলে দিব নাকের নতনী।"
"তোমার সাথে গেলে রে রাজার বেটা মা বলিব কারে"
"তোমার মাতার চেয়ে রে বেগম আমার মা জান খুব ভাল।"
"তোমার সাথে গেলে রে রাজার বেটা বাবাজান বলিব কারে ?"
"তোমার বাবাজানের চেয়ে রে বেগম আমার বাবাজান ভাল।"
"তোমার সাথে গেলে রে রাজার বেটা চাচাজান বলিব কারে"
"তোমার চাচাজানের চেয়ে রে বেগম আমার চাচাজান ভাল।"

(জ)

নীলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ ওড়োফুলের ডালে,
নীলে ঘোড়া বাঁধরে দামাদ কেয়াফুলের ডালে।
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল ছাওয়াল দামাদের গায়ে,
সেই না ফুল বাড়িয়ে প'ল রসিক দামাদের গায়ে,
সেই না ফুল খুঁটেরে দামাদ বাঁধে কোঁচার মুড়েয়,
সেই না ফুল খুঁটেরে দামাদ বাঁধে গামছার মুড়েয়।
সেই না ফুল খুঁটেরে দামাদ পাঠায় বিবির মায়ের আগে।
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির মা কাঁদে মনে মনে,
সেই না ফুল পা'য়ারে বিবির বোন ভাবে দেলে দেলে,
কোথাকার কোন সৈয়দ লুটিয়ে নিবের আ'ইছে।

(ঝ)

ধুঞ্চি ফুলের আটুনী, কুঞ্জে ফুলের ছাটুনী
চম্পাফুলের গিরিল বাগিচে।
ছাড়ে দেওরে কালেনি, ছাড়ে দেওরে মালেনী,
ছাড়ে দেও আমার টাউন ঘোড়ার লাগাম,
ছাড়ে দেও আমার চলন ঘোড়ার লাগাম।
আমি ফিরে আস্‌তি খাব বাটার পান
আমি ফিরে আস্‌তি ক'ব দু'চার কথা।
মায়ে ত বলেরে, ও ফুল মালারে,
তুমি ঘরে আসে খাও দুধ ভাত।
অওত ভাত খাব না, অওত ঘরে যাবো না
আমার মন চলেছে কালাচাঁদের সাথে
আমার মন চলেছে নীলা ঘোড়ার সাথে।
মায়েতে বলেরে ও আল্লা রসুলরে
বেটির জন্ম না হয় কার ঘরেরে।

(ঞ)

স্ত্রী "ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি ?"
স্বামী "তোমার বাবা মিলায়েছে বাজার
খাড়ায়ে তামাসা দেখ।
ঐ না বাজারে কিনিব সিঁদুর
পরিয়া নায়ারে যাবো।
কিসের জন্তি নায়ারে যাবেরে
প্রিয়া,, আমার 'পুরণী' নাই ঘরে,
কিসের জন্তি যাবারে নায়ারে

আমার জননী নাই ঘরে।"
"ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে
সাধু উয়্যারে বলে কি?"
"ঐ না বাজারে কিনিব নত্‌নী
পরিয়া নায়ার যায়ো।"

(ট)

স্ত্রী ভাত ত কড়্‌কড়্‌, ব্যন্নুন হ'ল বাসি,
ভাইধন আইছে রে নিবার রে
সাধুরে আমার নায়ার যাবার দাও।

স্বামী তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুলমালা,
আমার ভাত রাঁধবে কেডা,
তুমি যাবে নায়ারে, রে ফুলমালা,
আমার পান বানাবি কেডা?
"ছয় মাসের ভাত রে সাধু আমি ছয় দণ্ডে রাঁধিব
ছয় মাসের পানরে সাধু আমি ছয় দণ্ডেই দেব।"
"তুমি যাবে নায়ারে রে ফুলমালা
আমার বেছানা দিবে কেডা?"
"ছয় মাসের বিছানারে সাধু এক দণ্ডেই দেব।"
"তুমি নায়ারে গেলেরে ফুলমালা
আমার কথা কইবে কেডা?
ছয় মাসের কথারে সাধু আমি এক দণ্ডেই দে'ব।'

(৮)

চুয়া চুন্দন বাঁট্যারে লীলা বাসর কোটারা ভরে [১],
আমলা মেতি বাঁট্যারে লীলা আবের [২] কোটারা ভরে।
তোলা পানিতে নায়ারে বাপজান মাথা হয়েছে আটা,
মহীপাল রাজা কেটেছে দীঘি আমি সেই দীঘিতে যাব।

"কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেয়ো না দীঘির ঘাটে।
কলঙ্কিনী লীলারে তুমি যেয়ো না দীঘির ঘাটে।"
বাপেরে মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে,
মায়েরে মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে।
আগে পাছে দাসী বান্দী মধ্যে চললো লীলা,
আগে পাছে গোলাম নফর মধ্যে চললো লীলা।
হাঁটু পানিতে নাম্যারে লীলা হাঁটু মঞ্জন করে,
মাজা পানিতে নাম্যারে লীলা মাজা মঞ্জন করে।
বুক পানিতে নাম্যারে লীলা বুক মঞ্জন করে,
খবুরার আগে' ত খবর গেল মহীপাল রাজার কাছে।

যে লীলার জন্যেরে মহীপাল তুমি ভাঙ্গাছো নীয়ার,
যে লীলার জন্যেরে মহীপাল তুমি ভাঙ্গ্যাছো রোদ।
লীলার মাথার কেশ রে মহীপাল দীঘির পানি ছাপিয়ে পড়েছে।
কেশে বাজ্যা উঠছে রে মহীপাল কত রুই কাতলা,
যে লীলার জন্যেরে মহীপাল ভাঙ্গ্যাছিলা নীয়ার।

১ চুয়া ····ভরে=লীলা চুয়া ও চন্দন বাটিয়া বাসর ঘরের কোটায় ভরিয়া রাখিল।

২ আবের=অভ্রের, পূর্বকালে অভ্র দ্বারা চিরুণী কোটা ও পাখা প্রভৃতি নির্মিত হইত।

৩ খবুরার আগে=সংবাদ বাহকের মুখে

সেই লীলা আইছে রে মহীপাল তোমার সরোবরে,
এক দীঘির ঘাটেরে মহীপাল সাঁতরে বাসরে ফেরে।
বারে বারে ঘুর‍্যারে মহীপাল রাজায় চুল ধরিয়া রাখিল।

কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের দুঃখে মল্যাম,
বাপের মানা না শুন্যা আমি দীঘির ঘাটে মল্যাম।
কলঙ্কিনী লীলা গো আমি কলঙ্কিনী হলাম,
মায়ের মানা না শুনে আমার সকল সম্মান গেল।

মুর্শিদাবাদ জিলার মেয়েলী গান

মেয়েলী গানগুলির মধ্যে একটা সরস ও কোমল প্রাণের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। এই গানগুলি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও ইহার সহজ সুরে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। সত্যই এই গানগুলির মধ্যে বাংলার মেয়েদের প্রাণের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কে এই গানগুলি রচনা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, তবুও এই গানগুলি কবিত্ব রস-ধারায় অভিষিক্ত।

এই সঙ্গে তিনটি গান প্রকাশিত হইল। এই গানগুলি মুর্শিদাবাদ জিলার মেয়েরা গাহিয়া থাকেন। শুনিয়াছি কাজে মশগুল রহিয়াছেন, আর গুন্ গুন্ করিয়া ইহার দুই চারি ছত্র গান করিতেছেন।

এই গানগুলির বিষয় অতি সাধারণ, ইহাতে কোন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নাই। প্রথম গানটি বেহুলাকে লইয়া রচিত। বেহুলা কে তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন করে না। বড় ভাই ছোট বোন বেহুলাকে খেলাইতে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেহুলা খেলাইবার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইল, মাটির ঘর তৈয়ারী করিল। এমন সময় নাপিত (লাপিত) আসিয়া অনর্থক তাহার ধূলার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল এবং তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। সে আশ্বাস দিয়া বলিল,

"কাদার চুকার বদলে বেহুলা সোনার চুকা দিব হে,

ধুলার ঘরের বদলে বেহুলা দালান কোঠা দিব হে।"

বোধ হয় সুন্দরী বেহুলার ঘটকের কাজ করিয়া লোভী ঘটক কিছু লাভ করিবার আশায় এই আত্মীয়তা দেখাইতেছে।

দ্বিতীয় গানটির মর্ম্ম অতি চমৎকার। ভাই ডোলা (পাল্কী) সাজাই-তেছে, কিন্তু বোন কিছুতেই যাইতে রাজী নহে। আম গাছ কাটিয়া ডোলা সাজাইল, জাম গাছ কাটিয়া ডোলা সাজাইল, তবু সে যাইবে না। ভাই নিরুপায় হইয়া তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারের প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তাহাতেও তাহার মন টলিল না। সে সমস্ত অলঙ্কারগুলি তাহার ভাবী সাহেবাকে দিতে বলিল। গানটির মধ্যে অতি কচি মনের একটা বিফল প্রয়াসের করুণ ছবি পাওয়া যায়। ইহার ধুয়া, "ভায়া না যাব ডোলাতে" অতি নিবিড়ভাবে আমাদিগকে বেদনাহত করে। রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" কবিতাটির মধ্যে যে করুণ চিত্র উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়িয়াছে, ইহার মধ্যে তেমনি একটা সজল অাঁখিপল্লবের চিত্র রহিয়াছে। কিন্তু সে যাইব না বলা সত্ত্বেও যে তাহাকে যাইতে হইয়াছিল তাহা ধ্রুব সত্য।

তৃতীয় গানটিতে একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই রচয়িতার মনে ছিল। নতুবা তিনি দুল'ভের দামাদকে রাজপথ দিয়া লইয়া আসিয়া নানা-বিধ সুপেয় খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিলেন, অথচ দামাদের পিতার আগমনের পথ যেমন অপথ, তাঁহার খাদ্য সামগ্রী তেমনি অনাহার্য্য। গ্রামে যে এখনও বৈবাহিককে লইয়া ঈদৃশ রসিকতার অভাব নাই তাহা বলা বাহুল্য।

এই গানগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পাঠক নিজেই ইহার রস-ভোক্তা হউন।

(ক)

বড় ভাইয়ে কহিছে বেহুলা না যাইয়ো খ্যালায়তে হে।
ঘরে নাকি যায়্যা বেহুলা খ্যালাবার চুকো ল্যায়য়ো হে।
আরো নাকি ঢুঁড়ে বেহুলা খ্যালাবার সংধ্যাণী হে।
ঘরের বাহির হতে বেহুলাকে চালের বাধা লাগে হে।
বাড়ীর বাহির হতে বেহুলাকে চালের বাধা লাগে হে।
বাড়ীর বাহির হতে বেহুলার লাপিতের সনে দ্যাখা হে।
একো হাঁকো দ্যায়ো লাপিত আঁওনে বাঁওনে হে।
আরো হাঁক দ্যায় লাপিত বেহুলার সামনে হে।
একো লাত দিয়া লাপিত বেহুলার চুকায় ভাঙ্গে হে।
আরো লাত দিয়া লাপিত ধুলার ঘরো ভাঙ্গে হে।
কাদার চুকার বদলে বেহুলার সোনার চুকায় দিব হে।
ধুলার ঘরের বদলে বেহুলা দালান কোঠা দিব হে।
ধুলা না ঝাড়িয়া লাপিত কোলে তুল্যা লিল হে।

* * * *

(খ)

আম গাছি কাটিয়া ভায়া ডোলা সাজালরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
জাম গাছি কাটিয়া ভায়া ডোলা সাজালরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
সিঁথ্যার মানান সেন্দুর দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা সেন্দুর ভাইরে ভাবীকে শোভিবেরে

কপালের মানান টিক্‌লি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা টিক্‌লি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গলার মানান তাবিজ দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গলার মানান তাবিজ ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গায়ের মানান বডি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামরিনা বডি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
ড্যানার মানান বাজু দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা বাজু ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
সোনার জোড়া চুড়ি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা চুড়ি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে;
সোনারিনা আংটি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা আংটি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
নাকের মানান দোলক দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।

নাকের মানান দোলক ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
মাজার মানান গোট দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা গোট ভায়া ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
পায়ের মানান মল দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা মল ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
কত সুন্দর শাড়ি দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
হামারিনা শাড়ি ভাইরে ভাবিকে শোভিবেরে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
গায়ের মানান চাদর দিছি বহিন ডোলাতে চড়রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
আগের বছরে বহিন দিব তোমার বিহারে
ভায়া না যাব ডোলাতে।
চড় নাকি চড় বহিন না করিও ওজর রে
ভায়া না যাব ডোলাতে।

(গ)

আগার দিয়া আইল বিহাই পাগার দিয়া আইল বিহাই পো,
সরান দিয়া আইল দুলোবের দামান্দ না রে।
কিসে বা বসতে দিব বিহাইকে কিসে বা বসতে দিব বিহাই পোকে,
কিসে বা বসতে দিব দুলোবের দামন্দকে না রে।

মোড়াতে বসতে দিব বিহাইকে, মাচ্যাতে বসতে দিব বিহাই পোকে,
কিসে বা পানি দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
লোটাতে পানি দিব বিহাইকে, বধনাতে পানি দিব বিহাই পোকে,
ঝারিতে পানি দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
কিসের বা তেল দিব বিহাইকে, কিসের বা তেল দিব বিহাই পোকে,
কিসের বা তেল দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
রায়েরি তেল দিব বিহাইকে, মসিনার তেল দিব বিহাই পোকে,
ফুলেরিনা তেল দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
কিসের বা ভাত দিব বিহাইকে কিসের বা ভাত দিব বিহাই পোকে,
কিসের বা ভাত দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
সামারী ভাত দিব বিহাইকে, কোদার না ভাত দিব বিহাই পোকে,
বাঁশফুলের ভাত দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
কিসেরি ডাইল দিব বিহাইকে, কিসেরি ডাইল দিব বিহাই পোকে,
কিসেরি ডাইল দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
মটরের ডাইল দিব বিহাইকে, মসরির ডাইল দিব বিহাই পোকে,
সোনা মুগের ডাইল দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
শোলেরি মাছ দিব বিহাইকে, গজারের মাছ দিব বিহাই পোকে,
পেটি ইলসার মাছ দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
কিসেরি পান দিব বিহাইকে, কিসেরি না পান দিব বিহাই পোকে,
কিসেরি না পান দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।
কচুর না পান দিব বিহাইকে, ভ্যাটেরিনা পান দিব বিহাই পোকে,
ছাঁচি পানের খিলি দিব তুলোবের দামান্দকে না রে।

পাবনা জিলার মেয়েলী গান

(ক)

ওপার দিয়া যায় কেড়োরে
ছাতি মোড়ে দিয়া,
তোর না বিটিক্ মারত্যাছে
লোহার ডাঙ্গ দিয়া।
থাকো বিটি থাকো বিটি কিল গুড়ি খা'য়্যা,
আগুন মাসে নিমু তোমায়
কাঁহ্যা ধান কাট্যা।
কাঁহ্যা ধান চুটুর মুটুর
চ্যাঁপা ধানের খৈ,
লম্বা লম্বা সব্‌রী কলা
গোয়াল-মারা দৈ।

(গ)

আলুর পাতা থালু থালু
ভ্যান্দার পাতার দৈ,
সকল জামাই খায়্যা গ্যালো
মা'জল্যা জামাই কৈ?
আস্‌ত্যাছে আস্‌ত্যাছে শোলাবন দিয়া
শোলার শাক ভ্যাজা দিব
ঘেরতো মধু দিয়া।
বা'র বাড়ী গুয়ার গাছ করড় মরড় করে,
তারি তলে জামাই বসে অধিবাস করে।

—•—

বিবিধ গান

৭২

দিন যাবে মন, কাঁদবি রে বসে,
হায়রে তোমার কাঁদন কেউ তো শুনবে না;
কাঁদন কেউ তো শুনবে না
হায়রে কাঁদন কেউ তো দেখবে না।
মনরে
আরে একদিন যাবে দুঃখে আর সুখে,
চিরদিন তো সমান যা'বে না।

৭৩

আমার মন পাখী বিবাগী হ'য়ে ঘুরে মরো না,
ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা, জেনেও কি তা জান না।
দেহে আট কুঠরী, রিপু ছয় জনা,
মন থেকো থেকো, হুসিয়ার থেকো, যেন মায়ায় ভুল না,
কোন দিন হাওয়ারূপে প্রবেশিয়ে লুটবেরে ষোল আনা।
সাধের বাড়ী, সাধের ঘরকন্না,
সাধে, সাধে ঘর বাঁধিলাম, ঘরে বসত কল্লেম না,
সে দিন পাঁচ পাঁচা পঁচিশের ঘরে দেখবি আজব কারখানা।

৭৪

দৈব্যারাজ ঘোড়া ফিরছে সদাই
ভবের বাজারে।
দিবানিশি ঘোরে ফিরে
ধৈর্য্য নয় রে মানে।
সপ্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে,
এল ঘোড়া শোন্য ভরে;

হায়াত ময়ুত জানা যাবে
সেই ঘোড়ার সামনে।
সাধন ক'ল্লে পাবি তারে,
তার জোরে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে ;
তিনটি মায়ের একটি ছেলে,
হৈল কি প্রকারে ?
সেই ঘোড়া হৈল ঘোড়া
এইড়্যা দিল বত্রিশ জোড়া,
তিনু বলে খাড়াক্‌খাড়া
যাবি কোন বাজারে ?

৭৫

মন লও রে গুরুর উপদেশ
জানতে পার সহজে।
পাঁচ মশলা যোগ করিয়ে লাগাইয়াছে অন্ধাবেশ
মারুল পাড়া নবাই জোড়া (?)
ছানি চাম্‌রা কাগজে,
জানতে পার সহজে।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ যত আদি অন্ত তার কাছে,
মহাসাগর করিয়া লয়া পদ্মপাতে বসিয়াছে।
অধীন শ্রীনাথ বলে ভুলিয়াছি মায়াপাশে,
মায়া-বন্ধন হবে ছেদন গুরু যদি পরশে,
জানতে পার সহজে।

৭৬

ভবের হাটে দিচ্ছেন খেয়া গুরু কর্ণধার
কত হইতেছে রে পার।

ধনী মানী পার করে না, পার করে কাঙ্গাল
কত হইতেছে রে পার।
বেলা থাকতে দাও রে পাড়ি সময় নাই রে আর,
অসময়ে পারের ঘাটে গিয়ে ঠেকবে রে এবার
কত হইতেছে রে পার, ভবের ঘাটে।

৭৭

আমি ভজনহীন, সাধনহীন ;
কেমন করে পাব সাঁইজীর 'দীন' ?
সকলই করতে পার মুরশিদ,
বিচার তোমার ঠীন।
পাঁচু চাঁদের চরণ বিনে
হারাণ বাঁচে না একদিন।
দুগ্ধ হ'তে উঠে রণি, ঘোল টানতে বস্তুহীন ;
এমনি মতন দফ্‌ল আমাকে করলে দীনহীন।
খালি ভাণ্ড প'ড়ে রলো
মুরশিদ, কর্পূরের নাই চিন।
যেমন চাতকিনীর প্রাণ
মেঘের আড়ালে ব'সে ভাবে রাত্র দিন।
আমি ভজনহীন, সাধনহীন, কেমনে পাব
সাঁইজীর দীন?

৭৮

ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
আছে পঞ্চ নূরে,
নিরবধি সাথে ঘুরে ;
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে ॥

সেই ঘরেতে রূপের থানা,
লোভী কামী যেতে মানা,
আছে নিষ্কামে পঞ্চ জনা,
সেই ঘরে।
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
'হায়াত'* মূল সাধনের মাথা,
সাধন সিদ্ধি হ'লে কবে কথা।
তার উপরে চাঁদোয়া পাতা ; (কলে ঘোরে)।
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
গোলা মহর নুর ছেতারা,
খুলতে পারে রসিক যারা।
দেখতে পাবি রত্ন জোড়া, সাধন জোরে।
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।
(তাইরে না রে) সেইটার মাঝে,
চৌষট্টি তাল ঘড়ি বাজে।
এ অধীন তার ভাব না বুঝে
আশায় ঘোরে ;
ও ঘোর অন্ধকারের ভিতরে।

৭৯

এমন হবে আমি আগে না জানি।
আগে যদি জানতেম এত,
ভবের মায়াতে না হতেম রত,
আগে জানলে গুরুর চরণ করতেম তরণী।
সাধুর বাজারে গিয়ে,
রূপা বলে কিনলেম সীসে,
গুরুর তরণী দেখে তাইতে খেলেম 'চুবণী'।

---

* হায়াত—জীবন।

৮০

আমি মলেম আহা আমায় বাঁচাও যাগে যোগে।
কাল ভুজঙ্গের ছানা,
তারা দুই মুখে ধরে দুই ফণা,
ওরে তার ওঝাই মেলে না,
করে বরিষণ,
না রয় জীবন,
দরদী গো, প্রাণ গেল বিষের বিরাগে।
সাধ করে বড়শী গিলে,
আমি রহিতে না পারি জলে,
আমায় ডাঙ্গায় নেয় তুলে,
বড়শীর বিষম কালা,
না যায় খোলা,
দরদী গো, ছিপ দিলে মরমে লাগে।

৮১

ওরে মন আমার হাকিম হ'তে পার এবার
মন যদি হও হাকিম আমি হই চাপরাশী,
কনেষ্টবল হয়ে হাজির হই হুজুরি।
তোমার হুকুম জোরে,
আইন জারি করে,
আনবো চোরকে ধরে করে গেরেফ্‌তার।
ছিল পিতৃ বস্তু সত্য অমূল্য অসহ্য,
হরে নিল তায় মদন আচার্য্য,
চোরের এমন কার্য্য,
দীনুর না হয় সহ্য,
মদন রাজার রাজ্য শুদ্ধ অবিচার।

কাম্‌কে দাও না ক্ষমা, মত্ত হও দু'বেলা,
রুহের* সঙ্গে মোহ মদনের খুব জ্বালা।
'কোরক' যেমন দোষী,
মিয়াদ দেও তায় বেশী,
মদনকে দাও ফাঁসি, কামকে দাও দ্বীপান্তর।

ভাই বন্ধু দারা সুত আত্ম পরিজন,
সুসময়ের বন্ধু তাঁরা অসময়ের কেউ নন।
দিয়ে চোরের সঙ্গে মেলা,
হয়ে মাতোয়ালা
পেয়ে চাবি তালা, ভাঙ্গলে আমার দ্বার।

৮৮

উজান জলে পাড়ি ধরা রে গুরু আমার ঘোটল না।
ভবের নৌকাখানি উবুডুবু গুরু পাড়ি পেলেম না।
উজান জলে 'জলফলা' বেজে গেছে,
উজান ঠেলা আমি পাড়ি পেলেম না।
আমার কেশে ধরে নেও পার করে'
নইলে কূল আর পেলেম না।
গোঁসাই নলিনচাঁদ বলে,
যাস্‌নেরে আর নদীর কূলে,
গেলে পাবানা+ যখন, প্রেমের অনল উঠবে জ্বলে,
জল দিলে আর নিববে না।

৮৩

আজবতরী দেখে মরি গড়েছে কোন মিস্তিরী।
এ তরী বোঝাই নেয় ভারী,
আমি তিন বেলাতে বোঝাই করি,
তবু বোঝাই হয় না ভারি, মন ব্যাপারী।

---

* রুহ্‌—আত্মা, +পাবানা—পাবিনা।

তরীর ভাব দেখে সদায় আমি তাই ভাব্যা মরি।
তরীর মাল্লা আছে ছয় জন,
আর তিন জন বসে আছে তরীর পর,
আমি যে দিক টানতে কই সে দিক টানে না।
তার সদায় করে গোলমাল, বাজায় জঞ্জাল,
কোনদিন যেন সাধের তরী শুকন্যাতে হয় তল।
ছয়জনাতে ঐক্যমিলে তরী যাও বাইয়ে (যাও হে বাইয়ে)
তবু তার পাড়ি না জমে।
যে দিন 'বাণ' চুয়ায়ে উঠবে পানি, সেদিন তরী রবে না।
মন রসনা ! নৌকা ছাড়্যা পালায়া যাবে মাল্লা ছয়জনা।

৮৪

আল্লায় মোরে সৃষ্টি করে দি'ছালো দুইনার পরে।
ও তার নাম ধরি না, কাজ করি না
কি ভাবে রইলেম বইসে
যখন তলব করবে মালেক সাঁই,
কি জওয়াব দিব তান গো ঠাঁই,—
আমি বইসে ভাবি তাই,
যাইতে হবে সেই পথে।
ত্রিশ রোজা, পাঁচ ওক্ত নামাজ
পড় একিনে,
ও ভাই পড় একিনে।
মা বরকত দিল তরী,
রসুল হ'বে কাণ্ডারী,
সেদিন হবে ভবনদী পাড়ি।
শুনিছিরে আলেমের মুখে
দুই এমাম গুণ টানে।
আল্লার নামে তুলছি বাদাম,
যাব মোকামে।
ও ভাই যাব মোকামে,
দুইনায়ের মায়ায় ভুলে রইলাম
ফেরেবের জালে।

৮৫

ওরে নাগর কানাইরে,

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচারে ঘরের শোভা ভোয়া ।
নারীর শোভা সিঁতার সিঁদুর, গাঙের শোভা খ্যাওয়া ॥
আগে যদি জানতেম আমি রে প্রেমের এত জ্বালা,
ঘর করিতাম নদীর কূলে রহিতাম একেলা ।

৮৬

ডালিমের চারা দিয়া বিদেশেতে গেল পিয়ারে ।
আমার এও ত ডালিম রসে হেলে পল রে,
যে না পথে বাঘের ভয়, সেইনা পথে বধুঁ যায় রে,
কোনদিন যেন ধর‍্যা খায় বনের বাঘ রে ।
বঁধুর বাড়ী গঙ্গাপার, গেলে না আসিবে রে ।
আমার অজান বঁধু না জানে স াঁতার রে ।
বিধি যদি দিত পাখা, উড়ে যা'য়া করতাম দেখা রে,
আমি উড়্যা যায়া পড়তেম বঁধুর পায়েরে ।

৮৭

স াঁই দরবেশের কথা, একথা বলবো কারে ?
শুনবে কেরে, কারে বলব কি !
পরকে বুঝাতে পারি নিজে বুঝি নি ।
বলদ রলো গাভীর প্যাটে, লাঙল রলো হাটে
কিষাণের জন্ম না হতে পাহা গেল মাঠে ।
'আগ্‌নে' গেল গড়গড়াতে সূর্য্য ম'ল দীপে
গঙ্গা ম'ল জল পিপাসায়, ব্রহ্মা ম'ল শীতে ॥
আমি একটা কথা শুন্যা আ'লেম ত্রিবেণীর ঘাটে ॥

একটা ছেলে জন্ম হল তিন পোয়াতির প্যাটে।
রাজার বাড়ী চুরিরে পুষ্করিণীর পারে সিঁদ
জলের পর শয্যা পাড়্যা চোরা পাড়ে নিদ।

৮৮

হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ* তোমারে।
ঐ যে মুরশিদ মালেক মওলা,+
আর জানে সেই রসুলোল্লা,
মাস্ত÷হ'ল জগতের হিল্লা, ×
চরণ দাও মোরে।
হাজার হাজার সেলাম জানাই মুরশিদ তোমারে।
এমাম হোসেন হজরৎ আলি,
তাদের চরণ আমরা নাহি ভুলি,
জেন্দেগী ভর. দরুদ ভেজি
আমি তাদের পায়।
ও মা তোমার চরণ পাব বলে
ডাকছি দুই বাহু তুলে;
ও মা তবে কেন র'লি ভুলে,
এস এই সময়।

৮৯

গুরু বর্তমানে আমায় কর অনুমান
যোগীগণের যোগ সাধনে এই বুঝি তোমার বিধান।
গুরু গোঁসাই খেত করিয়ে নিলেম,
একখান পাঁচন হাতে চললেম,

* মুরশিদ পীর বা দীক্ষাগুরু। + মওলা—প্রভু।
÷ মাস্ত—বেঠিক, গণ্ডগোল। × হিল্লা—কায়দা, কৌশল;
বুদ্ধি জ্ঞান পীর সমীপে গোলমাল হইয়া যায়।

আমি গুরুর খেতে ধান নিড়াইবারে।
কে আমায় বানাল চাষী,
আমি নষ্ট করলেম গুরুর কৃষি, গুরু পদে হলেম দোষী,
ঘাস নিড়াইতে কাটলাম ধান।
বিলে কি ইল্‌শে থাকে? কিলালে কি কাঁঠাল পাকে?
মধু হয় কি বল্লার চাকে? বিশ্বাস করে কে?
গোঁসাই নলিনচাঁদ বলে
বর্ষা হয় কি বৃষ্টির জলে?
গুরু কি চাইলে মেলে, শুনেছো কোন স্থান।

৯০

জাগ্, জাগ্‌রে পামর মন;
জাগিয়া রইও।
কলির কয়টা দিন মন,
সাবধানে রইও।
মন—মন, জাগ, জাগ।
জাগিতে জাগিতে রে মন চক্ষে আইল নিঁদ,
নবরত্ন কোঠার মধ্যে চোরায় দিলে সিঁধ;
মন—মন, জাগ, জাগ।
সিঁধ না দিয়ারে চোরা এদিক ওদিক চায়,
সকল ধন থাকিতে চোরা মানিক লইয়া যায়।
মন মন, জাগ, জাগ।
উড়ি উড়ি যায়রে শুয়া* ফিরি ফিরি চায়,
না জানি থাকের দেহের কিবা গতি হয়।
মন—মন, জাগ, জাগ।

* শুয়া—পক্ষী বিশেষ।

৯১

ওরে অবোধের মন রে!
ও মন ছাড় বৈভবের মায়া রে।
একায় এসেছ ভবে
একায় মন তোকে যেতে হবে রে,
মন, ছাড় বৈভবের মায়া রে।
স্ত্রী-পুত্র বান্ধব যত
কেহই নয় মন তোর অনুগত রে,
তোর সঙ্গে কেউ তো যাবে না রে,
তা'রা ম'লে করবে দু'দিন শোক রে
ওরে অবোধের মন রে!

৯২

ডুবিল মোর মনের নৌকা রে!
কি ও নৌকা ঠেকিল বালু চরে রে,
ডুবিল মোর মনের নৌকা রে।
ডুবঁ ডুবঁ* করিয়া ঠেকিল বালু চরে,
ওরে কে আছে আপনার জন, তুলিয়া লবে কোলে রে।
ডুবিল মোর মনের নৌকা রে।
ওরে অখুটা + শিমিলার ÷ নৌকা দীঘল
সল্ সল্ করে,
পাপেতে হৈয়াছে ভারী রে
নৌকা শুকানাতে মরে রে।
ওরে শাল বাড়ীয়া শালের নৌকা
গুড়া বা সারি সারি।

---

* ডুবঁ ডুবঁ—ডুবু ডুবু। + অখুটা—অকাঠ। ÷ শিমিল—শিমুল তরু।

কাগা হৈল না'র কাণ্ডারী
শগুন হৈল ব্যাপারী রে।
পাপে পুণে ভরিনু রে নৌকা
তরিয়া যাবার আশে।
পাপের নৌকা টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌
পুণের নৌকা ভাসে রে॥
ডুবিল মোর মনের নৌকা রে।

৯৩

পিয়ারের খসম, খসম আমার আইলা না
কইয়া গেলে কাইলার হাটে যাই।
তিন দিন বাদে আস্‌বো গো খসম আমার
মানুষের উদ্দেশ নাই।
কোন বাঘ ভালুকের দেশে বা গেলা
তুমি জান বাঁচাইতে পাল্লা না।
যখন আমার মন হয় উতালা,
ঘরের পাশে কাঁদিগো বসে কদু গাছতলা,
ও আমার কদু গাছে ধরছে গো কদু,
তুমি ছালুন চাইখা গেলে না।
যখন আমি গোছল করবার যাই,
আমার দু'চোখ দিয়ে ঝরে গো পানি,
আমার খসম বাড়ী নাই।
তোমার বিবিজানের বিচ্ছেদের ছুরত
তুমি আপন চক্কে দেখলা না।

৪

মরি রাগে, অনুরাগের বাতি,
জ্বাল্‌গে নিজ ঘরে,
কোন ধামেতে আছে মানুষ,
চিনে নেওগে তারে।
মেরুদণ্ডের পূর্ব্বভাগে,
ধায় চন্দ্র দ্রুতবেগে,
কুল-কুণ্ডলিনী সর্পের আকার,
আছে সেই আসনের পরে।
সাধন ভজন বিহীন হ'লে,
যাবে যম ঘরে।
পূর্ব্বদ্বারে লাল চন্দ্র, দক্ষিণ দ্বারে শ্বেতচন্দ্র,
দুই চন্দ্রে দীপ্তকায় কি করে?
তুই ভাব না জেনে বসে রইলি
মোহ অন্ধকারে।

৯৫

সে ঘরের আট কুঠুরী,
দরজা সারি সারি,
করেছে কি কারিগরি,
বলিহারি কুদরত তাঁর।
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
সে ঘরে চিলে কোঠা,
সপ্ত তলায় আয়না আটা,
তার রূপের ছটা চমৎকার!
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।
মানিক-মুক্তা লাল জওহরা,

সেই ঘরে আছে পুরা,
ষোল জনা দেয় পাহারা,
দুই জনে তার চৌকিদার।
ঘরামীর উদ্দেশ করা ভার।

৯৬

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে লো সাঁই চৌদ্দ ভুবন জোড়া,
আবের ঘরমে আবের আড়া, আবের পরে রইছে খাড়া,
চার নূরেতে দেয় পাহারা, কলে দিচ্ছে মুড়া।
কি কব ঘরামীর কথা, হস্তপদ নাইক মাথা,
মুখ দেখিলে কয় সে কথা
বেজাম্মা সেই ছোঁড়ারে।

৯৭

ও দরদী সাঁই
আমি কিয়ের লাগি আইলাম হেথা
কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই।
পরথম ছিলাম তোমার ঘরে,
এক্ষণে আইলাম পরের দ্বারে
পর মোর হইল ভাই।
এখন পরের ব্যাগার খাট্যা মরি
পরের অন্ন খাই।
ছয় পর আছে ছয় দিকেতে,
বাঁধে মোর দিনে রাতে,
কতই দুঃখ পাই।
তবু তাদের লাগি ভিক্ষা মাগি
ছুটিয়া বেড়াই।

৯৮

জারিগান

হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন,
ওরে যে না পথে দিছিরে দুই ভাই জোরের ভাই এমাম হোসেন
সেই না পথে যাবো রে আমি, করো আমার গোর কাফন।
রাম লক্ষণ গেছেরে বনে অযুধ্যা ছেড়ে,
ঐ রকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে।
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ আর কি প্রাণের ভাই আছে
যে বলের বল কলে'ম রে জয়নাল, সে বল ভেঙেছে,
যার বলের বল করছো তুমি সে বল কি আমার আছে।
জহর গুলে আন্‌রে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।

বারোমস্যা

অঘ্রাণ মাসে নূতন খানা, পুষ মাসে হয় 'নায়ার মানা'
মাঘ মাস্যা শীত নারীর বুকেতে, কত পাষাণ
বেঁধেছে সাধু বিদ্যাশে।
ফাল্‌গুন মাসে দ্বিগুণ জ্বালা, চৈত্র মাসে শরীর কালা,
সহে না দুরন্ত জ্বালা নারীর বৈশাখে, হারে বৈশাখে।
জ্যোষ্টি মাসে মিষ্টি ফল, আষাঢ় মাসে নূতন জল,
শ্রাবণ মাস গেল নারীর জিয়ারে, হারে জিয়ারে।
ভাদ্দোর মাসে তালের পিঠা, আশ্বিন মাসে শশা মিঠা,
কাত্তিক মাসে গেল নারীর কাতরে, হারে কাতরে।
বারো মাস পূর্ণ হ'ল, নারীর সাধু দ্যাশে আ'লো, .
এলো সাধু র'লো কার বা মন্দিরায়, হারে মন্দিরায়।

চাকুরে সোয়ামী যার, এনা দুখ্.কের কপাল তার.
বচ্ছর অন্তে একদিন আসে নারীর মন্দিরায়, হারে মন্দিরায়।
হাল্যাচাষা স্বামী যার, কিনা সুখের কপাল তার,
সন্ধ্যা লাগ্.লে আস্যা বসে নারীর মন্দিরায়, হারে মন্দিরায়।

১০০

নীলার বারাস্যা

[এই বারাস্যা (বারমাসী) গানটি পাবনা জিলার চর খলিলপুরের জসীম খাঁ সাহেবের নিকট হইতে সংগৃহীত। বারাস্যা গানগুলি কৃষকগণের অতি প্রিয় গান, ধান পাট নিড়াইতে ও কাটিতে তাহারা এ গান গাহিয়া পল্লী মাঠ মুখরিত করিয়া তোলে।

সম্প্রতি রায় বাহাদুর ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের সম্পাদকতায় যে "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'নীলার বারাস্যা'র এক অংশ পাওয়া যাইবে। এই বারমাসী গানটি কবি জসীম উদ্‌দীন সাহেব সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে এই গানের একভাবমূলক কতকগুলি ছত্র আছে।

তার দিব তরু দিব রে পায়েতে পাশলী।
গলেতে তুলিয়া দিব নীল্যা সুবর্ণ হাসলী ॥
কানে দিব কর্ণফুল হা রে নাকে সোনার বেশর।
(ওরে) আরও কর্ম্ম কুইচ্যারে দিব যেমন ভ্রমরা পাগল ॥

(পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৩৫)

এবং "অষ্ট অলঙ্কারের" উল্লেখও আছে। এই গানটি যেন পল্লী পুষ্পের ন্যায় কোমল, পেলব এবং মধুর ভাবময়। এই ধরনের যে কত গান রহিয়াছে তাহা কে বলিবে ?]

নীলা ও সুন্দর রে ও আমার নীলা নুতুন কোরোল রে
তুমি ধোপ কাপড়ে লাগাইছো কালির মৈলাম রে।

এ না কালির মৈলাম রে ও মোর সাধু সাবানে উঠাবো রে
আমার মনের কালি না উঠে জনমে রে।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে ও মোর নীলা সাজালাম বাঙ্গালা রে
আমার দাঁড়ি-মাল্লা বস্যা স্থায় দরমা রে।
সীতাপাটি বেচ্যা রে ও মোর সাধু দাঁড়ি-মাল্লারে দেবো রে
তুমি আরো ছয় মাস রহিবা আমার ঘরে।
হাতের বাজু বেচে রে ও মোর সাধু দাঁড়ি-মাল্লারে দেবো রে।
তুমি আরো ছয় মাস রহিবা ও আমার ঘরে।
পাতাজলে নাম্যা রে ও মোর নীলা পাতা মাঞ্জন করে রে
আমার মনের কালি না গেল জনমে রে।
হাঁটু জলে নামিয়া রে ও মোর নীলা হাঁটু মাঞ্জন করে রে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর বাড়ী রে।
বুকজলে নামিয়া রে ও মোর নীলা বুক মাঞ্জন করে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে।
থুতু জলে নামিয়া রে আমার নীলা থুতু মাঞ্জন করে রে
আমার নীলার পরাণ না নেয় ঘর-বাড়ী রে।
ও সাধু বলে রে একে ত আশ্বিন মাসে নিশিভাগ রাতে
নিশির শয়নে দেখি নীলা তুই বড় যুবতী রে।
ও সাধু বলে রে একে ত অগ্রাণ মাসে মদনেরই বাড়ী
তোমার সর্ব্বাঙ্গে তুল্যা দেবো অষ্টালঙ্কার।
সাধু বলে রে একে ত পৌষ মাসে রে দু-গুণ পড়ে জার
একেলা ঘুমাও নারী জোড়া মন্দিরার ঘর।
ও নীলা বলে রে এমন নারী নহে আমরা ঘুমাইয়া ভুলি
পর রে পুরুষ নিয়া খেলা নাহি করি।
ও সাধু বলে রে খিল খাড়্যা বাঁকমল দেবো পায়েতে পাশলি
মাজাতে জিঞ্জিরা দেবো গলেতে হাঁসলি।

পরিধান বসন দেবো কামরাঙ্গা শাড়ী
তুই কানে ঝুল-বিস্তার দেবো সোনার মদনকড়ি।
ও নীলা বলে রে শাশুড়ীর তুল্ল´ভ আমার সোয়ামীর পরাণ
পর রে পুরুষ দেখি আমরা বাপ ভাই-এর সমান।
ও নীলা বলেরে একে ত মাঘ মাসে গাছে গুয়া পাকা
মোর সাধু আসবে ত্বাশে করবো আমি খেলা।

১০১

চিলার বারোমাসী

কাঁদে চিলা পদ্মরমণী লয়ে সখিগণ
বেলন কাষ্ঠের থাম্বা ধরিয়া রোদন।
আহারে বৈদেশী সাধু তুই বড় নিষ্ঠুর,
বঞ্চিত করলি মুখের অন্ন সিঁথ্যার সিন্দুর।
অঘ্রাণ মাসেতে চিলালো নারী খ্যাতে পাকা ধান,
খাও আর বিলাও লো চিলা ভাত আর পান।
খাও আর বিলাও লো বর্ষকালের ধন,
শেষ কালেরও জন্য রাখিও সম্বল।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে পৌষ মাস।
পৌষ না মাসেতে চিলালো নারী হামেলা,
চিলা নারীর যৌবন দেখ্যা গুঞ্জরে ভ্রমরা।
গুঞ্জরে গুঞ্জরে ভ্রমরা ফুলের মধু খায়,
ফুলের মধু ফুলে র'ল ভ্রমর উড়ে যায়।
এও মাস গেল চিলা নারীর না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে মাঘ মাস।
মাঘ মাসেতে ওগো চিলালো নারী তুগুণ পরে জার,
চিলা নারী বিছানা পাতে শয়ন মন্দির ঘর।

অবলা তুলার বালিশ কথা নাহি কয়,
আহারে বৈদেশী সাধু তোরে লাগল পাই।
অঞ্চলে বিছায়ে আমি রজনী পোহাই।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে ফালগুন মাস।
ফালগুন মাসেতে চিলালো নারী ফাগু খেলে-রাজা,
আম্ব্র ডালে ভরসা করে কোকিল সাজায় বাসা।
সাজাক সাজাক বাসা তোলাক দু'টি ছাও,
সোনা দিয়া বাঁধ্যা দেবো কোকিলার পাও।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে চৈত্তির মাস।
চৈত্তির মাসেতে চিলালো নারী এ শাক নালিতা,
সবের মুখে লাগে ভালো চিলার মুখে তিতা।
রাঁধিয়া বাড়িয়া শাকরে সোমরাইতাম থালে,
মোর সাধু থাকতো দেশে দিতাম তার ঐ গালে।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে বৈশাখ মাস।
বৈশাখ মাসেতে চিলালো নারী কৃষাণে বোনে বীজ,
কোটর গুলায়া আমি খা'তেম গরল বিষ।
বিষ খা'তেম জহর খা'তেম জানতো বাপ মায়,
আমার দিছিলো বিয়া দূর দেশে ঠাঁই।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে জৈষ্ঠি মাস।
জৈষ্ঠি না মাসেতে গাছে পাকা আম,
মোর সাধু থাকতো ছাশে থাইতাম আম।
আম থাইতাম কাঁঠাল থাইতাম পঞ্চ গাভীর দুধ,
শয়ন মন্দিরে বস্যা করিতাম কৌতুক।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে আষাঢ় মাস।
আষাঢ় মাসেতে চিলালো নারী গাঙে নতুন পানি,
কত সাধু বায় নৌকা উজান ভাটানী।
যার সাধু গেছে পাছে সেও ত আ'ল আগে,
মোর সাধু গেছে আগে খাইছে বনের বাঘে।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে শাঁওন মাস।
শাঁওন মাসেতে চিলালো নারী খেতে ভাসে নাড়া,
নাড়ার উপর বস্যা ডাকে নিদারুণ কোঁড়া।
ডাক ডাকে ডাকিনীরে ডাকে তনুর হ'ল শেষ,
নিদারুণ কোঁড়ার ডাকে ছাড়বো রাজার দেশ।
যে না দেশে গেছেরে সাধু সেই না দেশে যাও,
সেই না দেশে যায়ারে কোঁড়া ডাকো ঘনঘন,
শুনিয়া কোঁড়ার ডাক সাধু দেশে করবি মন।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে ভাদ্দর মাস।
ভাদ্দর মাসে চিলালো নারী গাছে পাকা তাল,
মোর সাধু থাকতো দেশে খাতাম পাকা তাল।
এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে আশ্বিন মাস।
আশ্বিন মাসে চিলালো নারী দেবী দুর্গার পূজা,
ঘরে ঘরে করে পূজা বাঁওনের বিধবা।
আহারে বৈদেশী সাধু তোরে লাগল পাই,
অঞ্চল বিছায়া রে সাধু আমি রজনী পোহাই।

এও মাস গেল চিলার না পুরিল আশ,
নবরঙ্গ নউলী যৌবন সামনে কার্ত্তিক মাস।
কার্ত্তিক মাসে চিলালো নারী ক্ষেতে পরে নেতি,
মোর সাধু আ'লো দেশে কাঁধে লইয়া ছাতি।
আহারে বৈদেশী সাধু তুই বড় নিষ্ঠুর,
বঞ্চিত করলি মুখের পান সিঁথ্যার সিন্দুর।
সিঁথির সিন্দুর আমার মৈলাম হল,
আসমানের চন্দ্র সূর্য আবেতে ঘিরিল।

১০২

বালির বারোমাসী

আগর চন্দন বাটিয়ারে হারে বালি কোটরায় সাজাল
কি হাঁলো বালি স্নান করো যমুনার জলে,
দাসী বাঁদী লইয়ারে, হারে বালি চলিল,
কি হাঁলো বালি স্নান করো সান বাঁধা ঘাটে।
পাতা জলে নামিয়ারে
হাঁলো পাতা মাঞ্জন করে
কি হাঁলো বালি স্নান করো যমুনার জলে।
হাঁটু জলে নামিয়ারে
হাঁলো বালি হাঁটু মাঞ্জন করে
কি হাঁলো বালি স্নান করো সান বাঁধা ঘাটেরে।
মাজা জলে নামিয়ারে
হারে বালি মাজা মাঞ্জন করে
কি হারে বালি স্নান করো সান বাঁধা ঘাটেরে।
বুক জলে নামিয়ারে
হাঁরে বালি বুক মাঞ্জন করে।
কি হাঁলো বালি স্নান করে আউলে মাথার কেশে।
হারে বালি স্নান কররে
কি হারে বালি এ না স্নান কররে
কি হাঁলো বালি সামনে পড়িল রসের বান্ধারে।

হারে হাটে যাও বাজারে যাওরে
হারে বান্ধা ডানি বামে ঘোররে
কি হারে সন্ধ্যা লাগলে যেও আমার বাড়ী।
চাল দেব ডা'লরে দেব
কি হারে বান্ধা রুসাই করে খেও
কি হারে বান্ধা শুতে দিব জোর মন্দির ঘরে।
কিনা বাঁশী বাজাও রে
কি হারে বান্ধা ক্ষীর নদীর কূলে
কি হারে বান্ধা বাঁশীর স্বরে পাগল করলি আমারে।

১০৩

রাধার বারমাসী

জষ্ঠি না আষাঢ় মাসে ও রাধে নদীতে উজায় মাছ,
ওরে রাধা যায়রে জল ভরিতে কানাই লাগল পাছ
বাঁশীটি থুয়ে কানাই নামে হাঁটু জলে
নেতের অঞ্চল দিয়া রাধা বাঁশী চুরি করে।
বাঁশীটি হারায়ে কানাই ভাবে মনে মন
এমন সুরের বাঁশী নিল কোন জনে।
বাঁশীটি হারায়ে কানাই যায়রে গোয়াল পাড়া
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাসা করে তোমরা এ বাঁশী চোরা।

*　　*　　*

"কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া,
একেলা পাঠাইছে ঘাটে কলসী কাঁখে দিয়া।"
"ভাল আমার মাতাপিতা ভাল আমার হিয়া,
একেলা পাঠাইছে ঘাটে বুকে পাষাণ দিয়া।"
"কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া,
এত বড় হইছো কানাই না করিছ বিয়া।"
"ভাল আমার মাতাপিতা ভাল আমার হিয়া,
তোমার মত সুন্দর পেলে তয়সেন করব বিয়া।"

"ও কথাটি ছাড় কানাই, ও কথাটি ছাড়,
গলেতে কলসী বেঁধে জলে ডুবে মর।"
"কোথায় পাব এ না কলসী কোথায় পাব দড়ি
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরি।"

• • •

রাত তুই যারে পোহায়ে
ওরে পরাণ বিদরে আমার প্রাণনাথের লাগিয়া।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল গৃহে লাগাও বাতি।
রঁাধিয়ে বাড়িয়ে অন্ন জাগব কত রাতি।
রাতের যখন এক পহর ডালে ডাকে শুয়া,
ওরে ফুলশয্যা বিছানায় রাণী কাটে চিকন গুয়া।
রাতের যখন দুই পহর ফুল ফোটে কেওয়া,
ওরে রাধিকার যৌবন দেখে গুঞ্জরে ভ্রমরা।
রাতের যখন তিন পহর ছুটে সর্ব্ব ঘাম
ছেড়েদে মন্দিরের কেওয়াড় জুড়াব পরাণ।
রাতের যখন চার পহর যাবে গোয়াল পাড়া,
কাড়ে' নেবে হস্তের বঁাশী ছিড়বে গলার মালা।
এ রাত প্রভাত হলরে পূর্বে উদয় ভানু,
রাধিকার অঞ্চল ধরে বিদায় মাগে কানু।

১০৪

রাধার বারোমাসী
পীরিতি পীরিতি বিষম চরিতি রে
কে বলে পীরিতি ভাল,
ওরে কালিয়া সনে করিয়া প্রেম
আমার ভাবিতে জনম গেল।

সে বড় কালিয়া না গেল বলিয়া
আর কত দিন রব আশে,
আমি ডাকিয়া ভাঙ্গিলাম রসের গলারে
আরে তবু না পা'লাম মন রে।
ওরে রাধানাথ পর কি আপন হয়।
বঁধুর বাড়ী ফুলের বাগিচারে
তাহার উপরে ফুল,
কত গুঞ্জরে ভ্রমরা
রাধিকা মজায় কুল।
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানালাম রে
নয়নে পাড়িলাম কালি।
আমি হৃদয় চিরিয়া লেখন লিখিয়া
পাঠালাম বন্ধুর বাড়ী।
সাগর সেঁচিলাম ধিয়ের* পাতিলাম
মাণিক পাবার আশে,
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
আপনার কর্ম্ম দোষে।
আরে ঘষির আগুনে তুষের ধুঁয়ায়
জ্বলে জ্বলে মরি,
আমি এত না করিয়া যোগা'লাম মন রে
তবু না পা'লাম মন রে।

———

*ধিয়ের—মৎস্য ধরিবার এক প্রকার যন্ত্র।